॥ পঞ্চম অধ্যায় ॥

সমাজসম্পর্কান্বিত রবীন্দ্র কবিতার কাব্যরূপ
(বলাকা থেকে শেষলেখা)

দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন সমাজ - সম্পর্ক যেমন বিষয়গতভাবে প্রভাব ফেলেছে রবীন্দ্র কবিতায় তেমনি তার পরোক্ষ প্রভাবও এসে পড়েছে এই পর্বের রবীন্দ্র কবিতার আঙ্গিকে — তার শব্দনির্বাচনে, উপমা প্রয়োগে এবং ছন্দবিবর্তনে। কবিতায় বিষয়ের সঙ্গে তার আঙ্গিকের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে থাকে। বিষয় বিষয়ের দাবিতেই উপযুক্ত আঙ্গিক নির্বাচন করে নেয়। অবশ্য নির্বাচন কথাটির মধ্যে যে সচেতনতার ভাব নিহিত আছে পদ্ধতিটি ততোটা সচেতন নয়। তাছাড়া সমাজ - সম্পর্কের প্রভাব যতো প্রত্যক্ষভাবে বিষয়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয় আঙ্গিকের মধ্যে সেই প্রভাব অনেক পরোক্ষ, অনেক জটিল এবং দূরান্বয়ভাবে পড়ে।

আলোচ্য 'বলাকা' পর্বের কবিতা আলোচনা করলেই ব্যাপারটি বোঝা সহজ হয়। মধুসূদন পয়ারের ভাবার্থকে প্রবাহিত করবার জন্য চরণান্ত ছেদবিধি অস্বীকার করেছিলেন এবং অন্ত্যমিলের পরিবর্তে মধ্যমিল ব্যবহার করেছিলেন। মধুসূদন এ ক্ষেত্রে পয়ারের নিয়ম লঙ্ঘন করে অমিত্রাক্ষর ছন্দে যথেষ্ট গতির ঊর্মিলতা সঞ্চার করলেও তিনি পয়ারের ১৪ মাত্রার পর্ব - বিভাগ কিন্তু রক্ষা করেছিলেন। অবশ্য শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন [1] যে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা ছন্দের'- ও পূর্বাভাস আছে মধুসূদনের নীতিগর্ভ কোনো কোনো কবিতায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা ছন্দে' যে তীব্র গতি সঞ্চার করেছেন সেই গতি মধুসূদনের নীতিগর্ভ কবিতায় ছিল না। সেই গতি বরং কিছুটা ছিল গিরিশচন্দ্রের গৈরিশ ছন্দে। কিন্তু নিতান্তই নাটকীয় সংলাপের প্রয়োজনেই

১। ছন্দের বারান্দা, শঙ্খ ঘোষ, ১৩৮৭, পৃষ্ঠা ৫ - ৬

গৈরিশ ছন্দের জন্ম । 'ওড' জাতীয় বা বিশুদ্ধ গীতি কবিতায় 'বলাকা ছন্দ' অভূতপূর্ব গতি সঞ্চার করেছে । মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে ৮ - ৬ মাত্রার পর্ব - বিভাগ রবীন্দ্রনাথ চূর্ণ করে দিলেন । একমাত্র তিনি বজায় রেখেছেন পূর্ণ পর্বে আট মাত্রার সীমা । পূর্ণ পর্ব আট মাত্রা — 'বলাকা ছন্দে'র এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়ে গেলো পয়ারের দূরাগত উত্তরাধিকার ।

পর্বত চাহিল হতে । বৈশাখের নিরুদ্দেশ । মেঘ ,
তরুশ্রেণী চাহে , পাখা । মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি ।
ওই শব্দরেখা ধরে । চকিতে হইতে দিশা । হারা ,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা ।

'বলাকা' কবিতাটির (বলাকা) এই ছন্দ বিশ্লেষণের মধ্য থেকে দেখা যায় সমস্ত পূর্ণ - পর্ব পয়ারের মতোই আট মাত্রার । কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রত্যেক চরণ ১৪ মাত্রা হবার যে বাধাবাধকতা ছিল 'বলাকায়' রবীন্দ্রনাথ সে বাধাবাধকতা তুলে দিলেন । ফলে এখানে ছন্দ হ'য়ে উঠেছে তীব্রভাবে গতিময় । প্রমথনাথ বিশী 'বলাকার ছন্দ' সম্পর্কে বলেছেন , —

'বলাকার তৃতীয় অভিনবত্ব — এর নিয়মিত শ্লোক - বন্ধ - মুক্ত ছন্দ , যাহা এখন বলাকার ছন্দ নামে চলে । অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভবের পরে বলাকার ছন্দ উদ্ভব সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ আবিষ্কার । অমিত্রাক্ষর ছন্দ কবিকে পয়ারের নিয়মিত গতি হইতে মুক্তি দিয়াছিল , এবারে বলাকার ছন্দ কবিকে নিয়মিত শ্লোকবন্ধ হইতে মুক্তি দিল । অমিত্রাক্ষর অক্ষরবৃত্ত ছন্দে স্বাধীন গতি দিয়াছে , এবারে বলাকার ছন্দ অক্ষরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত উভয় ছন্দে গতিদান করিল । পয়ারে ও নিয়মিত শ্লোকবন্ধে কবি অনেক পরিমাণে ছন্দের অধীন , অমিত্রাক্ষরে ও বলাকার ছন্দে ছন্দ কবির অধীন । ইংরেজিতে যাহাকে **Verse Paragraph** বলে , ব্যাখ্যাস্থলে যাহাকে আমরা কবির

প্রয়োজনানুযায়ী ছন্দের ব্যূহসজ্জা বলিতে পারি — এই দুই ছন্দ তাঁহার পত্তন করিল ।[২]

বাস্তবজীবনের যে অভিঘাত 'বলাকা' কাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যেই রয়েছে সেই অভিঘাত যে এই গতিময় ছন্দের জন্ম দিয়েছে এ কথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে । অধিকাংশ সমালোচক এই গতির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বার্গসঁ-র Creative Evolution — তত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন । যেমন ডঃ ক্ষুদিরাম দাস বলেছেন, 'শূন্যে প্রবহমান বেগের কম্পন এবং পরবর্তী 'বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত' প্রভৃতি Creative Evolution থেকে আহৃত আইডিয়ার প্রকাশ মাত্র ।'[৩] কিন্তু আইডিয়ার জগতে এই গতির উৎস সন্ধান না করে বরং বাস্তব জগতের অভিঘাতে এই গতিময় ছন্দের জন্ম হয়েছে এই দাবি করাটাও অযৌক্তিক হবে না । ক্রান্তদর্শী কবি প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সমস্ত জগৎ সংসারের মধ্যে যে গতির সত্য অনুভব করেছিলেন তারই প্রেরণায় এই ছন্দের জন্ম । 'বলাকা'র প্রথম কিছু রচনায় যেমন 'সবুজের অভিযান' বা 'শঙ্খ' কবিতায় পুরনো ছন্দের অনুবর্তনই পাওয়া যায় । তখনো পর্যন্ত নতুন জীবনের প্রচণ্ড চাপ আত্মপ্রকাশ করেনি । যখন থেকে সেই চাপ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তখন থেকেই 'বলাকা'র সমস্ত উল্লেখযোগ্য কবিতায় কবি নতুন ছন্দে রচনা করেছেন । 'বলাকা'র প্রথম চারটি কবিতাতেই কবি যৌবনের শক্তিকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং কর্মের পথে জীবনকে ডাক দিয়েছেন । একদিকে জরাজড়, অচল জড় মন ও অন্যদিকে জীবন - যৌবনকে দাঁড় করিয়ে দুয়েরই বৈপরীত্য শাব্দিক কৌশলে তুলে ধরলেন তিনি । যৌবনের শক্তিকে কাঁচা, সবুজ, অবুঝ, দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত, প্রমুক্ত, চিরযুবা, অমর প্রভৃতি শব্দে সম্বোধন করে ব্যবহৃত ওই শব্দগুলোর মধ্যেই যেন এক একটি জীবন্ত প্রাণবন্যাকে উচ্ছলিত করে

* *

২। রবীন্দ্র সরণী - প্রমথনাথ বিশী, ১৩৮০, পৃষ্ঠা — ১৫৪ - ১৫৫ ।

৩। চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী — ডঃ ক্ষুদিরাম দাস, ১৩৭৩, পৃষ্ঠা - ১৭৪ ।

তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ । আর সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবীণ দলকে — জীবনের জালসাকে আধমরা, পরম পাকা, পুঁথি - পোড়ো প্রভৃতি শব্দে চিহ্নিত করে তুললেন । নবযৌবন বিধিবিধানকে নিয়তি বলে মানতে রাজী নয় । চলতে গিয়ে আঘাত - সংঘাতকে মেনে নিয়ে তার যে চলা তাতেই আত্মার মুক্তি ঘটে । যৌবনের রক্ত লালও বটে । তাই রক্ত আলোর মদে , রক্ত , রক্ত মেঘের ঝিলিক , রক্তস্রোত , রক্তপায়ে , রক্তজবা প্রভৃতি শব্দও যৌবনের অশান্তি প্রসঙ্গেই ব্যবহৃত হয়েছে কবিতাগুলোতে । এ ছাড়া উপযুক্ত চিত্রকল্পও কবি সৃষ্টি করেছেন সব কবিতাতেই । ঝড়ের মাতন , অট্টহাসি , তড়িতভরা ঝড়ের মেঘ , অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচা , অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেটে , রক্তস্রোতে আগুনে মেতে । আয় না বধূর বেশে গো , মাথার পরে ডাক দিয়েছে । যথা - দিনের সূর্য , ডানা , খাঁচা , পুচ্ছ , ঢেউ , অন্ধকার , আলো প্রভৃতি চিত্রে যৌবনের দুঃসাহসী প্রবৃত্তির প্রসঙ্গই যেমন তুলে ধরেছেন তেমনি বিপরীত দিকে ঝিমোনো প্রবীণদের জড়তাও যেন ওই একই সঙ্গে আভাসিত । সমাজের নবতম জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে নবীন এবং প্রবীণ — দুই দলের পার্থক্য নির্দেশ করবার ব্যাপারে পাখীর পুচ্ছ নাচিয়ে আকাশ পথে উধাও হ'য়ে যাওয়া এবং আবার ডানায় নিজেকে গুটিয়ে অন্ধকার খাঁচায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকার চিত্র দুটি সর্বাংশেই সার্থক । এ প্রসঙ্গে দু'টি উদাহরণ ('বলাকা'র 'সবুজের অভিযান' কবিতার অংশ বিশেষ) উদ্ধারযোগ্য —

(১) রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে ,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা ।

(২) ঐ যে প্রবীণ , ঐ যে পরম পাকা ,
চক্ষু - কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা ,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ - করা খাঁচায় ।

যেহেতু স্থিতি আর গতি নিয়েই জীবনের ছন্দটি পরিপূর্ণ ,– তাই বলাকার 'শাড়ি' কবিতায় ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে দিয়েই কূল ছাড়া জীবনস্রোতের তরীর গতিধ্বনি শোনা যায় । কবিতার প্রথম স্তবকটিতে সাগরে উত্থিত প্রকৃতির ঝড় ঝঞ্ঝার উত্তাল রূপটি ইয়োরোপে সদ্যোত্থিত যুদ্ধ - ঝড়ের ভয়ঙ্কর বার্তা বহন করে এনেছে । আঁধার রাত শব্দদুটি কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে যেমন জীবনের , আসন্ন যুদ্ধের বিপদকে বুঝিয়েছে তেমনি তারার আলো , ফুলের গুচ্ছ , শুভ্র রজনীগন্ধা শব্দসমষ্টি জীবনের আশার , আনন্দের , গতির , শান্তির , প্রেমের অনুভবই ব্যক্ত করেছে । এ ছাড়া মানিক , রতনের ভার , ছুরী , ভেরী শব্দগুলি সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব – লোভ , সংঘর্ষ আর আত্মপ্রচারের অহংকারকে তুলে ধরেছে ।

এক মনে প্রলয় পারাবার পার হ'য়ে তবেই অজানা কিন্তু ঈপ্সিত নতুন সৃষ্টির উপকূলে পৌঁছনো সম্ভব । কবির এই বিশ্বাস , এই তরী বেয়ে যাত্রার কথা যা আগেও কবি অনেক কবিতায় বলেছেন তাকেই নতুনতর ভঙ্গীতে তুলে ধরলেন বলাকার ৩৭ সংখ্যক কবিতায় ,

কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার ,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন ,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন ,
হে নির্ভীক , দুঃখ - অভিহত ।

"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি ।" সমাজের , বিশ্বের নতুন উপদ্রবের মধ্য দিয়ে এগোবারে নির্দেশ এ কবিতায় বারবার "বন্দরের কাল হল শেষ" এই ধ্রুবপদের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত । কবিতাটিতে ব্যক্তির পাপ ও পাপকে সমাজ - রাষ্ট্র - বিশ্বের পাপের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ কেননা বিশ্বযুদ্ধের যে অভিশাপ তার বিধ্বংসী লীলা বিপর্যস্ত করবে নির্বিশেষে সকলকেই ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পরে লেখা হ'লো বলাকার ৫ সংখ্যক কবিতা

আর এখান থেকেই বলাকার সমাজসম্পর্কান্বিত সমুদয় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ের উপযোগী শব্দ , চিত্রকল্প ও ছন্দ রচনা করে কবিতার ভাববস্তুকে স্পষ্ট তুলে ধরেছেন । ঘরছাড়া , দিকহারা , অকূল আলো , পথ , ঘাট , পাল , হাল , কূল , মুক্তি , স্রোত , যাত্রা , যাত্রী , ছুটি , সমুদ্রতীর , তরী , পাড়ি , কূলছাড়া নেয়ে প্রভৃতি শব্দ এবং ছুটল , ভাঙল , থামল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ উক্ত কবিতাগুলোতে বার বার ব্যবহৃত হ'য়ে সমাজে , রাষ্ট্রে , জীবনে বৃহত্তর পৃথিবীতে গতির ভাবনাকে তুলে ধরেছে আর একই সঙ্গে সম্মুখপথে বাধা , অশান্তি , যন্ত্রণা , বন্ধন , যুদ্ধ ইত্যাদিকে অতিক্রম করে যাবার কথা বলেছে । শান্তির এবং নিত্যজ্যোতির অনুধ্যান সাদা পাল , শুভ্রন মল্লিকা , শ্বেত রজনীগন্ধা , ফুলের সুগন্ধ , মঙ্গল শঙ্খ , সন্ধ্যার দীপালোক , স্বর্ণ , প্রভাত আলো প্রভৃতি শব্দ পরিবেশনের মধ্য দিয়ে প্রতিভাত । এ ছাড়া বন্ধনের , জীবনের জীর্ণাবস্থা , অসন্তোষ , চরম দুর্যোগ , হানাহানি ইত্যাদি অনাসৃষ্টি ঘনিয়ে উঠেছে কবিতাগুলোতে মত্ত সাগর , ঝড় , বাদল রাতের কালি - ঢালা ভয় , আঁধার তুফান , মরণপথ , বেড়ি , বৈশাখী মেঘ , গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখা , লালসা , সূর্যাস্তের প্রলয় শিখা , রক্তের বর্ষণ , সংঘাতের ঘর্ষণ , ক্রন্দনের কলরোল , বঞ্চিতনা , বঞ্চনা , বিচ্ছেদের হাহাকার , পাপ , অমঙ্গল , হিংসা - হলাহল , ভয় , কুজ্ঝটিকা , আগুন , শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ , পুষ্পসর্প ক্ষুদ্রফণা , রুদ্র , সিংহ - পলক আঁখি , রক্তস্রোত , অশ্রুধারা , বিগ্রহ - ঝটিকার মেঘ , তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি , আসিছে কাণ্ডারী , কলুষ রক্ত নয়ন , সিঁধ কেটে চুরি প্রভৃতি শব্দ ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে । রূপ অনেক যৌবনের । সে বিস্ময় - ভোলা — সে খ্যাপা । যৌবনশক্তি যেমন রাশি রাশি ফোটে ফুলের মতো , আবার তেমনি ঝরেও যে যায় সেটা তার অপব্যায়িতরূপ নয় — এখানেই সে সম্পূর্ণ , মরণপথেই তার ডাক পড়ে । রৌদ্রপায়ী পাগল চাঁপা আর উদ্দণ্ড বকুল এই রুদ্র পৌত্রীয় যৌবনশক্তির সার্থক উপমান । পৃথিবীর পুঞ্জীভূত পাপের বিচার প্রার্থনা করেছেন কবি বিধাতার কাছে । এই বিধাতাই রুদ্রদেবতা ,— তাঁকে সুন্দর , রুদ্র , প্রেমিক প্রভৃতি বলে সম্বোধন করে কবি আপনার বক্তব্য রেখেছেন তাঁর চরণে । এই রুদ্রকল্পনা গোটা রবীন্দ্রকাব্য জুড়েই স্থান পেয়েছে ।

'বলাকায়' তৎসম ও তদ্ভব দুই ধরণের শব্দ ও পদই ব্যবহৃত হ'য়েছে। আলোচ্য প্রত্যয় ও পরোক্ষ সমাজ সম্পর্কান্বিত কবিতাগুলোতে উল্লেখযোগ্য তৎসম শব্দ ও পদ যেমন গর্জমান, প্রাস, নীড়, নীহারিকা, হংসবলাকা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন তদ্ভব শব্দ ও ক্রিয়াপদের পাশাপাশি। এ ছাড়া পুরনো কাব্যিক শব্দ ও পদও কিছু কিছু ব্যবহৃত হ'য়েছে। তৎসমধাতু ও নামধাতুজাত ক্রিয়াপদও আছে। যেমন — উচ্ছ্বসি, উচ্ছুয়া, আকম্পিছে, ঘূর্ণিল, ঝাপটিছে, শিহরিল ইত্যাদি। 'বলাকা'য় সমাসের ব্যবহারেও বৈচিত্র্য এনেছেন কবি। আঁধারের যাত্রী, পথিক, দুরন্তজীবন নির্ঝরিনী, হংস - বলাকা, ঢেউ, খরস্রোত, নব নব পূর্বাচলে, উদ্দাম উধাও, পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বত, চন্দ্রলের পদধ্বনি, মহাস্রোত, অকূল আলোতে প্রভৃতি শব্দ, ভাষা ও চিত্রকল্প কবির প্রত্যাশিত পথিকে আবার কখনো বা অপ্রত্যাশিত অভ্রবন্দরকে প্রকাশ করেছে।

নীহার রঞ্জন রায় 'বলাকা'র কবিতা সম্পর্কে বলেছেন, —

"বলাকা"য় কবির অসমছন্দে কবিতায় এক নূতন আঙ্গিক সৃষ্টি করিয়াছিলেন — শক্তি ও বীর্যে, শব্দ - সজ্জা নৈপুণ্যে, ধ্বনি - গাম্ভীর্যে সেই ছন্দ বাংলা কাব্যে এক নূতন ঐশ্বর্যের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই ভঙ্গি, অসমছন্দই "বলাকা"য় আর এক নূতন রূপ দেখা দিল — সর্বপ্রকার অলংকার বর্জিত, একান্ত সহজ ঘরোয়া শব্দ ও বাক্যভঙ্গিতে সরল ও অন্তরঙ্গ অথচ কোথাও অভদ্র নয়, বরং মুক্ত, মুক্ত, সহজ ও স্বাধীন। কবিতাগুলি অনেকটা গদ্যের ধরনে বলা, মুক্ত সহজ ভাষায়, আগাদের কবিত্ব ধরা পড়ে চকিতে বিদ্যুৎ ঝলকের মত এখানে ওখানে কোন উপমায়, হঠাৎ কোনও চিত্রাভাসে অথবা রহস্যগর্ভ কোনও বাক্যে। তাহা ছাড়া কাব্যাভাস বোধ হয় ছড়াইয়া আছে শব্দগুলির টানা - পোড়েনের মধ্যে, শব্দগুলিই যেন কাব্যময়।' [৪]

৪। রবীন্দ্র - সাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা — ৫০ - ৫১

এ কথা ঠিকই যে 'পলাতকা'র কবিতাগুলিকে ছন্দে লেখা ছোটগল্প বলেই যেন মনে হয়। এই ছোট গল্পগুলির বিষয় আগেই দেখানো হ'য়েছে। বাঙালী সমাজে নারীর উপরে উৎপীড়ন এবং তা থেকে তার তীব্র মুক্তির আকাঙক্ষা সেখানেই স্পষ্ট। সুকুমার সেন ঠিকই বলেছেন 'পলাতকা' (১৯১৮) বলাকারই উপসংহার'।[৫] এখানে ছন্দ বলাকার মতোই প্রবহমান কিন্তু তত তীব্র গতিময় নয়। বলাকায় যে দ্রুদঙ্গ - নির্ঘোষ সম্ভব হ'য়েছিল অসংখ্য সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহারের ফলে পলাতকায় ছন্দের সেই মৃদঙ্গ - নির্ঘোষ শোনা যায় না। কিন্তু যেহেতু – "পলাতকার কাহিনী-গুলিকে আশ্রয় করিয়া পিঞ্জর মুক্ত ক্লিষ্ট মানবাত্মার উদ্দেশে জীবনধাত্রীর বাহুবন্ধন ব্যাকুলতা যেন বেদনাস্রুতে গলিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে"[৬] – সেই কারণেই পলাতকার ছন্দে যেন পাওয়া যায় একতারার গুঞ্জন। সমাজে নারীর স্থান কবিতায় রূপায়িত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র আদর্শ জগতের মহিমান্বিত স্তর থেকে বাঙালী গৃহস্থ মধ্যবিত্তের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। এমন সমস্ত শব্দ পলাতকায় কবি ব্যবহার করেছেন যা বলাকা কাব্যে অভাবনীয় ছিল। সেটা ঘটেছে 'পলাতকা'র বিষয়ের দাবীতেই। তাই 'পলাতকা' কাব্যের মধ্যে এসে যায় রোমান্টিক হরিণের পাশে প্রতিবাস্তব "ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা"। পোড়ারমুখী, কাঙাল, খিজিবিজি কালির আঁচড়, রেলের কুলি, নষ্টামি, মাতামাতি, ভাঙাচুড়ি, বিবিয়ানার ছাঁদ, ইত্যাদি আটপৌরে গার্হস্থ্য শব্দ 'পলাতকা' পর্বে রবীন্দ্র কবিতায় অনর্গল এসে যায়। আরও লক্ষ্যণীয় হয় যে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের ইংরেজী শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহারের যে বহুমূল অভ্যাস তাকেও রবীন্দ্রনাথ চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন কাব্যে মধ্যবিত্ত সমাজের নারীজীবনের বেদনার কথা রূপায়িত করতে গিয়ে। ইস্টেশন, প্ল্যাটফরম নভেল, প্যাসেঞ্জার, গ্রুইজ, ক্যাম্বিস্যার, থিয়েটার, মেজেস্টারি, প্রিন্সিপাল,

****

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ১৭২

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, সুকুমার সেন, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭২।

এপৃত্যাখিন ইত্যাদি ইংরেজী শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঐ উদ্দেশ্যকে রবীন্দ্রনাথ চরিতার্থ করেছেন বলে মনে হয় । তবে তুলনামূলক হিসেবে এখনও রবীন্দ্র কাব্যভাষার স্বকীয় শব্দই পরিমাণে অনেক বেশী , এই জাতীয় আটপৌরে বা ইংরেজী শব্দ তুলনায় অনেক কম । এখনও যেমন রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত ছন্দের গণ্ডীতে আবদ্ধ , তেমনি পরিশীলিত ললিত রবীন্দ্র কাব্যভাষার এলাকা থেকেও তিনি পুরোপুরি বেরিয়ে আসেন নি ।

'বলাকা'র ছন্দ ছিল অক্ষরবৃত্ত বা কলাবৃত্তে লেখা । 'পলাতকা'য় 'বলাকা'র প্রবহমানতা আছে কিন্তু ভাষা বা ছন্দে 'বলাকা'র আভিজাত্য নেই । শব্দ যেমন আটপৌরে হ'লো তেমনি 'পলাতকা' 'বলাকা' - ধরণের গতিময়তা বজায় রেখে ছন্দের দিকে থেকে লৌকিক হ'য়ে এলো । 'পলাতকা' কাব্যের ছন্দের আশ্রয় ছড়ার ছন্দ বা দলবৃত্ত ছন্দ । 'কালো মেয়ে' কবিতায় যেমন —

যে - কথাটা । কান্না হয়ে । বোবার মতন । ঘুরে বেড়ায় । বুকে
উঠল ফুটে । বাঁশির মুখে ।
বাঁশির ধারেই । একটু আলো, । একটুখানি । হাওয়া ,
যে - পাওয়াটি । যায় না দেখা । স্পর্শ - অতীত । একটুকু সেই । পাওয়া

দৈনন্দিন সামাজিক স্তরে নেমে এলো 'পলাতকা'র ছন্দ এবং সেই দিক থেকে বিচার করলে 'বলাকা' থেকে 'পুনশ্চ'র গদ্যছন্দে আসবার পথে 'পলাতকা'র ছন্দগত পরীক্ষা যেমন এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ তেমনি 'বলাকা' ও তার পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির সুপরিমার্জিত ভাষার জগৎ থেকে 'পুনশ্চ'র অন্ত্যজ শব্দবহুল কবিতার যাত্রাপথে 'পলাতকা' মধ্যবর্তী পদক্ষেপ । তার সেই পদক্ষেপচিহ্নই আলোচ্য পলাতকার শব্দ ও ছন্দের মধ্যে বর্তমান । এই কাব্য সম্পর্কে এডওয়ার্ড টমসন্ বলেছেন , — " Palatake could not have been written by any but a great poet.The ease and freedom are extraordinary, slang losing its slanginess and sliding into poetry ". 7

****

৭। Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist, Edward Thomson, 1979, PP 255 - 56.

পূরবী থেকে পরিশেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থগুলিতে আঙ্গিকগত বিবর্তনের পরিচয় তেমন পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্যিক জীবন পর্যালোচনা করলে এই সত্য বারে বারে লক্ষ্য করা যায় যে এক ধাপ এগিয়ে তিনি কখনো কখনো ঈষৎ পেছিয়ে যান। ফলে তাঁর বিপ্লবাত্মক বিবর্তন অত্যন্ত গোপন এবং প্রচ্ছন্নভাবে ঘটে যায়। যেমন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে তিনি সাধুক্রিয়া ব্যবহার করেন বটে কিন্তু শব্দ নির্বাচনে প্রায় চলিত ভাষার স্তরে নেমে আসেন। আবার পরবর্তী 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে চলিত ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে আঙ্গিকগত অগ্রগতির পরিচয় দিলেন, কিন্তু শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেছিয়ে গিয়ে সাধুপন্থী শব্দ ব্যবহার করলেন। এই ব্যাপারটি যে কবির সাহিত্যিক জীবনে বারে বারেই ঘটেছে তার উদাহরণ রবীন্দ্রকাব্যের এই পর্বেও পাওয়া যায়। 'পলাতকা'য় আঙ্গিকগত অগ্রগতির পর 'পূরবী', 'মহুয়া' এবং 'পরিশেষে' তিনি খানিকটা যেন পেছনে সরে গেলেন। সেই পরিশীলিত, সুমার্জিত রবীন্দ্রকাব্যভাষা এই কাব্যগুলিতে কবি ব্যবহার করলেন এবং ছন্দের দিক থেকেও মিশ্র - কলাবৃত্ত এবং কলাবৃত্তে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখলেন। কাব্যগুলোতে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হ'য়েছে - অনির্বচনীয়, অভিসারিকা, অম্বুর, অলক্ত, অলিন্দ, অণীয়ান, অভিরুচি, আলিম্পন, আগ্নেয়, আকূতি, উদ্দীপ্ত, উৎক্ষেপ, ঊর্মী, কেতন, কার্মুক, কুবলয়, কিংশুক, খড়্গ, চীর, চেতন, তপন, দিগ্বলয়, পর্ণ, ভঙ্গুর, মঞ্জীর, রভস, নিশাচরী, নিষ্কলুষা, দ্যুলোক, বল্কল ইত্যাদি। বেশ কিছু কাব্যিক শব্দের ব্যবহারও এই পর্বে লক্ষ্য করা যায়। যেমন, - আছিল, কভু, পরশ, বরিষণ, মম, হরষ, হিয়া, আছিনু, পশিল, জিনিল প্রভৃতি। আবার উক্ত সবগুলি কাব্যেই নামধাতুর প্রচুর ব্যবহার আছে - অঞ্জলিয়া, উচ্ছলি, নিরখিবে, প্রতীক্ষিয়া, মর্মরিছে, হিল্লোলিয়া, অভিষিঞ্চি, গুঞ্জরিবে, উৎসারিয়া, উচ্ছ্বসি ইত্যাদি। এই পর্বের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রচুর সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার। যেমন - আলোকবঞ্চিত, ক্লান্তি অলস, পুষ্পবিভোর, মধ্যাহ্নতাপিত, উপল উপকূল, তৃণরোমাঞ্চিত, বেণুবনচ্ছায়াঘন, স্মিতহাস্য বিকশিত, মৃত্যুতরঙ্গিণীধারা - মুখরিত, জ্যোৎস্নাকজ্জ্বলা, তন্দ্রাযবনিকা, পুষ্পভৃতা, নিত্যপ্রবাহিনী, কুয়াশাবিলীন,

শিশির-মন্থর, প্রভাত কিরণপায়ী ইত্যাদি ।

এই সমস্ত ভাষাগত বৈশিষ্ট্য থেকে প্রমাণ হয় যে এই কাব্যগ্রন্থের ভাষা 'বলাকা'র পূর্ববর্তী রবীন্দ্র কাব্যভাষা থেকে পৃথক নয় । তবে এই পর্বের কবিতায় এমন এক ভাষাগত সংযম ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় যা পূর্বে ছিল না । যে গীতিময় উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তাকে যেন এই পর্বে দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ দেওয়া হ'য়েছে । 'পূরবী'র 'যাত্রা' (৫ আশ্বিন ১৩৩০) কবিতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করলেই এই গাঢ়তা এবং ভাষাগত সংযমের বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়বে । দুঃখ, বাধা, বিপদ, মৃত্যু ও ভয়ঙ্করতাকে কবি এখানে কী আশ্চর্য সংযমের সঙ্গে সঙ্কেতিত করেছেন,—

রিক্ত বৃষ্টি মেঘ সাথে, সৃষ্টিছাড়া ঝড়ের বাতাসে,
যায়, যেথা শঙ্করের টলমল চরণ পাতনে
জাহ্নবীতরঙ্গমন্দ্র - মুখরিত তাণ্ডব - মাতনে
গেছে উড়ে জটাভ্রষ্ট ধুতুরার ছিন্নভিন্ন দল,
কক্ষচ্যুত ধূমকেতু লক্ষ্যহারা প্রলয় - উজ্জ্বল
আত্মঘাত - মদমত্ত আপনারে দীর্ণ কীর্ণ করে
নির্মম উল্লাসবেগে, খণ্ড খণ্ড উল্কাপিণ্ড ঝরে,
কণ্টকিয়া তোলে ছায়াপথ ।"

— যাত্রা, পূরবী ।

রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের আরো একটা বৈশিষ্ট্য — তাঁর বিচিত্র স্তবক নির্মাণের দক্ষতায় । অনেক সমালোচক মনে করেন সমস্ত ইংরেজী রোমান্টিক কাব্যের কবিরা স্তবক উদ্ভাবনে যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলায় একা রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তার চেয়ে বেশী । [৮]

****

৮। সঙ্গ নিঃসঙ্গতা - রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা : ১১০ (পাদটীকা)

'পূরবী'র প্রথমদিকে দলবৃত্ত ছন্দে লেখা কয়েকটি কবিতা আছে। 'মহুয়া' এবং 'পরিশেষ'র দলবৃত্তে লেখা দু'টি একটি কবিতাকে মনে হতে পারে — যেন 'বলাকা'র পর্ব থেকে ছিটকে এসে পড়েছে। হালকা ভঙ্গীতে লেখা 'পূরবী'র 'শিলঙের চিঠি', 'খাপের মাড়ি', 'চিঠি' প্রভৃতি কবিতা সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছন্দ দলবৃত্ত হ'লেও শব্দ নির্বাচনের জন্য কবিতাগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। অনুরূপভাবে এই পর্বের কোনো কোনো কবিতায় বলাকার ছন্দ ব্যবহৃত হ'লেও, যেমন — 'পূরবী'র -'লিপি'বা 'মহুয়া'র 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছে, সেগুলির বিষয় - স্বাতন্ত্র্যের জন্য বলাকার ছন্দের ধাবমান গতি অনুভূত হয় না। এ ছাড়া 'পূরবী'র কোনো কোনো কবিতায় সমাজভাবনা সেই কবিতার শব্দ নির্বাচনকেও কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে তা দেখা যেতে পারে। 'বিজয়ী' কবিতাটিতে,—

মশাল আদের বুদ্বুদনায় উঠল জ্বলে ,—
অন্ধকারের ঊর্ধ্বতলে
বহ্নিদলের রক্তকমল ফুটল প্রবল দম্ভভরে ,

এই যে বুদ্বুদনায় জ্বলে উঠবার ভঙ্গী এর পেছনে কবির সমাজ সচেতনতাই কাজ করেছে। এ কবিতার দৃশ্যবর্ণের বিজয় - রথ, বীর, দণ্ড, প্রাচীর, রক্ত - ধূলির পথ বিপথে, মশাল, বুদ্বুদনা, বহ্নিদলের রক্তকমল, নবীন সূর্য, অন্ধকারের রুদ্ধ কপাট প্রভৃতি শব্দ, কাব্যভাষা ও চিত্রকল্প 'বলাকাপর্বে'র কবিতারই মতো যৌবন, গতি ও শক্তির প্রাচুর্যকে ধ্বনিত করে তুলেছে। এই কাব্যেরই 'চিঠি' কবিতাপত্রটিতে বাংলাদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা ও তার প্রকাশের উপযোগী শব্দ, ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছে, —

ঘরের খবর পাই নে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপানি পুলিস সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।
শুনছি নাকি বাংলাদেশের গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে করছে আটক আলিপুরের জেলে।
হিমালয়ের যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জ্বালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।

এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলাদেশের যৌবনেরে জ্বালিয়ে করবে সারা ।

এ ছাড়া এ কবিতাতেই রয়েছে , —

যেগীন - পাম - এর সম্মুখে পাই ভুঁই ফুলের এই গান , উক্ত উদ্ধৃত কবিতাংশে প্রতিটি শব্দ গভীর এবং স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট রাজনৈতিক অবস্থা প্রকাশের অনুকূল । আর এজন্য পৌরাণিক তুলনাও রমণীয়ভাবে কার্যকরী হ'য়ে উঠেছে ।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে দেশের অভ্যন্তরে নারী জাগরণের যে স্বতঃস্ফূর্ত বেগের আবেগ চারদিকে তর্জনী তুলেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে 'মহুয়া' কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুলোতে নারীপ্রেমের ও নারীর মহনীয় অস্তিত্বের বলিষ্ঠ কণ্ঠ শোনা গেলো , পুরুষের সঙ্গে তুলনায়' তাই 'মহুয়া'য় 'জীর্ণমজ্জা কাপুরুষ' (অর্ঘ্য) শব্দ দু'টি পুরুষত্বহীন পুরুষকে ধিক্কৃত করেছে এবং একই সঙ্গে দেশের যুবকদের দুর্বল , জীর্ণ মনকেও যেন চিহ্নিত করে দেয় । কিন্তু আবার নারীর শক্তিতে তথা সৃষ্টির উদ্যমে কবি যে আশা স্থাপন করেন তা 'বিপুল বিস্ময়', 'সৃষ্টির নিস্ময়' (প্রতীক্ষা) প্রভৃতি শব্দের মধ্য দিয়ে আভাসিত । 'দুর্গম পথ - মাঝে', 'দুর্দম বেগে', 'দুঃসহতম কাজে' , 'রুদ্র দিনের দুঃখ' (নির্ভয়), 'দুর্গমের দুর্গ', 'শুধু শূন্য চেয়ে রব', 'সার্থকের পথ', 'দুস্ত কঠিনতা', 'বিনম্র দীনতা', 'দুর্বল লজ্জার' (সবলা), 'নিষেধ', 'নিমুখ', 'কঠোর বেদন', (পরিচয়), 'উত্তিষ্ঠত'(উজ্জীবন) প্রভৃতি শব্দ ও বাক্যাংশ ব্যবহারের ভেতর দিয়ে বর্তমান ও আগামী দিনে নারীপুরুষের জীবনে তাদের প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্কট মুহূর্তটিকে এবং তারই মধ্য দিয়ে অর্জিত পরিপূর্ণ শক্তির কথাই বললেন রবীন্দ্রনাথ ।

'হে অতনু , বীরের তনুতে লহো তনু'

(উজ্জীবন) — এই বাক্যটি ও শব্দসমষ্টি 'মহুয়া'র বক্তব্য বিষয়টিকে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তুলেছে । শুধু প্রেম কেন , জীবনে চলবার সমস্ত ক্ষেত্রেই এই বীর্যবত্তাই তো সমাজের ও জীবনের কাম্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন । এ ছাড়া 'আকাশে আকাশে ঢালে রক্ত ফেন সুরা' (শুভযোগ । মহুয়া) পলাশ শিমূলের এই

রক্তবর্ণ আলিম্পনের মধ্যেই নারীর অপূর্ব রক্তিম প্রেম সুধার ব্যাপক স্ফূর্তি মূর্ত হ'য়ে উঠলো আর তাতে অভিনব হ'লো চিত্রকল্পটি ।

'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বক্সাদুর্গস্থিত রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতায় 'নিশীথেরে' ও 'অন্ধকারে' একই বাক্যে ব্যবহৃত সমার্থবোধক শব্দ দুটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ । 'অন্ধকার' শব্দটি 'কারান্ধকার'কেই চিহ্নিত করেছে । 'অন্ধকারে রবির বন্দন — বাক্যাংশে কারাবন্দীগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এ যেন সত্য ঘটনা ও এই বক্তব্যেই রাত্রির কঠিনতার মধ্যেই দিনের আলোর জন্য প্রতীক্ষা জেগে থাকে , তবে নৈসর্গিক এই প্রতীক্ষার চাইতে বন্দীদের আলোর জন্য প্রতীক্ষা কঠিনতর সন্দেহ নেই । কবিতাটিতে 'অন্ধকার - রবি' , 'শিঙ্খলে ও সঙ্গীত' , 'বন্দীর - মুক্তের' প্রভৃতি বিপরীত অর্থবহ শব্দগুলি পাশাপাশিই ব্যবহৃত হ'য়েছে ।

'পরিশেষ'র 'প্রশ্ন' কবিতায় যুগজীবনের যন্ত্রণা , দেশের মুক্তিকামী যুব সম্প্রদায়ের উপরে বিদেশী শাসকবর্গের অন্যায় অত্যাচার, দেশের অভ্যন্তরের পরিস্থিতির অন্যায় আর বিক্ষুব্ধ নিদারুণ সঙ্কটের চিত্রই রবীন্দ্রনাথ যেন তুলে ধরলেন 'গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে' , 'হেনেছে নিঃসহায়ে' , 'প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে', 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে', 'কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিস্ফল মাথা কুটে', 'বাঁশি সঙ্গীতহারা' , 'অমাবস্যার কারা', 'দুঃস্বপনের তলে' প্রভৃতি শব্দ , বাক্য ও বাক্যাংশ প্রয়োগের মাধ্যমে ।

অন্ধকার ও আলো , দুর্বলতা ও বীর্যবত্তা জীবনের এই দুই ধারার কথা যা রবীন্দ্রনাথ কবিতায় বার বার উল্লেখ করেছেন তাকে কবি 'পরিশেষ'র বিভিন্ন কবিতায় নির্ভীক , বীর , বিপদের দুর্গ , পায়ের শৃঙ্খল , মুক্তি , ভীরু , সংশয়ের ভার (অবাধ । পরিশেষ) প্রভৃতি শব্দের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন । 'নিষ্ঠুরের অত্যাচার', 'বঞ্চনা লোভীর' (সান্ত্বনা) ইত্যাদি শব্দ কবি অত্যাচারী ইংরেজ শাসক , ধনাপানলোভী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষক রাষ্ট্রের প্রসঙ্গেই ব্যবহার করেছেন । 'জাতিজাতি - মাঝে বুদ্ধ' (প্রার্থনা) এই সমাসবদ্ধ পদটুকুতেই তৎকালীন রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক

বিরোধকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ ।

এ ছাড়া 'পিঞ্জরিত বিহঙ্গম সম' চিত্রটি সমাজের 'শৃঙ্খলবন্ধন - অপমানেরই' প্রতিরূপ । 'নখ দন্তে হিংস্র বিভীষিকা' বাস্তব এই চিত্র , বাক্যাংশে ব্যবহৃত হয়ে 'আত্মজাতি - ঘাতক মূঢ়' এই বক্তব্যেরই পরিপোষক হ'য়ে উঠেছে । বুদ্ধের আবির্ভাব ও আশীর্বাদকে স্মরণ রেখে লেখা 'পরিশেষ'র প্রার্থনা , বুদ্ধদেবের প্রতি , বুদ্ধ জন্মোৎসব প্রভৃতি কবিতায় দুর্গতি , দীনের নির্ভর , দুর্ভাগ্যের কান্না , দুর্বলের মুক্তি- বুদ্ধি , প্রমাদ বিহ্বল অহংকারে , নিঃসীম অপমান , দুঃখদ্বার , হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী , নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব, লোভজটিল বন্ধ , বিষশ্বাস - বিকারজীর্ণ, রক্তকলুষ গ্লানি , মর্মশল্য , দক্ষিণ - পাণি , সঙ্গীতরণ প্রভৃতি শব্দ , বাক্য ও সমাসবদ্ধ পদ একদিকে সমাজের দেশের ও পৃথিবীর হানাহানি , পারস্পরিক সংঘাত ও অন্যদিকে এরই হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বুদ্ধের আশীর্বাদ ও তাঁর ক্ষমার প্রসন্ন বাঙ্ময় হয়েছে ।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন –

"গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলেম । এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে । সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে পদ্য- ছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কি না । ... তখন আমি নিজেই পরীক্ষা করেছি , 'লিপিকা'র অল্প কয়েকটি লেখায় সেগুলি আছে । ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয় নি – বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ । . . . গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয় , পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ রীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে । অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস এবং সেই দিকে লক্ষ রেখে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কবিতাগুলি লিখেছি ।"

'পুনশ্চ' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন সে কথা 'পুনশ্চ' পর্বের আরও তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'শেষসপ্তক', পত্রপুট' এবং 'শ্যামলী' সম্পর্কেও খাটে। এই উদ্ধৃত অংশ বিশ্লেষণ করলে মনে হয় যে নিতান্ত আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যেই রবীন্দ্রনাথ গদ্যছন্দে কবিতা লিখেছিলেন। কিন্তু কোনো শিল্পীর মনে আঙ্গিকগত পরীক্ষা নিরীক্ষার অভিপ্রায় তখনই জাগে যখন তিনি কোনো একটা প্রয়োজনের তাগিদ বোধ করেন। গদ্যছন্দ উদ্ভাবনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অন্তত দুটি কারণে তাগিদ অনুভব করেছিলেন বলা যেতে পারে। তাঁর 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থ 'সাহিত্যে নবত্ব', 'সাহিত্যধর্ম' এবং 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধ তিনটি পড়লে বোঝা যায় যে ব্যক্তিগতভাবে কোনো কোনো আধুনিক কবির সঙ্গে হৃদ্যতা থাকলেও 'আধুনিক কবিতা'র প্রতি তিনি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করতে পারেন নি। অত্যন্ত সম্প্রতি প্রকাশিত শঙ্খ ঘোষের 'ঊর্বশীর হাসি' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বোঝাপড়ার এক সকলন' প্রবন্ধটি এই মতকেই জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — "তিমি ফুল পর্যন্ত ফুলের রূপের ঐশ্বর্য প্রচুর, তবু হাটের রাস্তায় তাদের চরম গতি বলেই কবিকল্পনা তাদের নমু নমস্কারের প্রতিদান দিতে চায় না।" [৯] কবির মনের এই যে 'শুচি-বায়ুগ্রস্ততা' আধুনিক সাহিত্য তা ঘুচিয়ে দিয়েছে — এতে কবি সায় দিতে পারেন নি। আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে কবির দ্বিতীয় আপত্তি তার মধ্যে যৌন ব্যাপারের একটা অসংগত 'বেআব্রুতা' [১০] এসেছে। তৃতীয়ত, আধুনিক সাহিত্যে পাওয়া যায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুকরণ। চতুর্থত, আধুনিক সাহিত্যে অপূর্বতা বা অরিজিনালিটি দেখাতে গিয়ে চমক সৃষ্টির দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়। পুরনো সাহিত্যের বিরুদ্ধে গতানুগতিকতার অভিযোগ আসে বটে, আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধেও বাঁধা গতের অভিযোগ তোলা যায়। "আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে —

****

৯। রবীন্দ্ররচনাবলী - চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩২৮।

১০। রবীন্দ্ররচনাবলী - চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩৩১।

অপটু লেখকের কল্পনায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির - কারি - পাউডার'। ওর মধ্যে একটা হচ্ছে দারিদ্র্যের আস্ফালন, আর একটা লালসার অসংযম"[১১] কিন্তু আধুনিক সাহিত্যের প্রতি এই বিরূপতা সত্ত্বেও এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ সেই সাহিত্যের দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন। 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে নিবারণ চক্রবর্তী চরিত্র কল্পনায় এবং নিবারণ চক্রবর্তীর মুখে পরিহাসের ভঙ্গীতে হ'লেও কাব্যের পালাবদল সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বসানো হ'য়েছে তাতে বোঝা যায় আধুনিক কাব্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা নাড়া দিয়েছিল। অন্তত বাস্তবতার দাবিকে তিনি অনেক পরিমাণে মেনে নিতে বাধ্য হ'য়েছিলেন, আর শুচির পুরনো অভ্যাসকে বর্জন করেছিলেন। রান্নাঘর ওদের জাত মেরেছে বলে তিনি বকফুল, বেগুনের ফুল বা কুমড়ো ফুলকে তাঁর কাব্যের এলাকা থেকে বহিস্কার করতে উদ্যত নন। সুতরাং শুধুমাত্র অশিক্ষিত পরীক্ষা নিরীক্ষার তাড়নায় নয়, সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে যেখানে আমাদের বাস্তব জগতকে কাব্যের অধিকারভুক্ত করে কাব্যের সীমানাকে প্রসারিত করার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথ গদ্যরীতির কবিতারচনায় অগ্রসর হ'য়েছিলেন।

প্রধান তাড়না অবশ্য বাস্তবতা। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের শেষ পর্বে বিশেষত তিরিশের দশকে রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ উঠলো। প্রধানত কল্লোলের কবি এবং সাহিত্যিকেরা ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হ'লেও বারে বারে অভিযোগ করে বলেছেন যে রবীন্দ্র সাহিত্য বাস্তবস্পর্শরহিত এক ভাবলোকে আমাদের প্রস্থান করায়। তারও আগে একই অভিযোগ করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা। কল্লোলের পূর্বগামী কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত রবীন্দ্র-কবিতার যে সমস্ত প্যারডি রচনা করেছিলেন তার মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে উচ্চারিত হ'য়েছে একই অভিযোগ। এই অভিযোগ এতভাবে এবং এত বেশী পরিমাণে উত্থাপিত হ'য়েছিল যে সেই সব সুপরিচিত অভিযোগের নিদর্শন দেবার প্রয়োজন নেই। একথা অনুমান করবার সঙ্গত কারণ আছে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যের বিরুদ্ধে এই

* *

১১। রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৩৩৪।

অবাস্তবতার অভিযোগের জবাব দেবার প্রয়োজনেও গদ্যরীতির কাব্যরচনায় অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। গদ্যকবিতার পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি উপমার ভাষায় লিখেছেন,— "নাচের আসরের বাইরে আছে এই উঁচুনিচু বিচিত্র বৃহৎ জগৎ, রূঢ় অথচ মনোহর, সেখানে জোরে চলাটাই মানায় ভালো, কখনও ঘাসের উপর, কখনও কাঁকরের উপর দিয়ে।" [১২] বোঝা যায় রূঢ় মনোহর বিচিত্র বৃহৎ জগতের বাস্তবতাকে রূপায়িত করার প্রয়োজনে তাঁর গদ্য কবিতার সৃষ্টি। তার মধ্যে তিনি আনতে চেয়েছেন, "একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব" [১৩] অর্থাৎ বাস্তবতা।

'পুনশ্চ'র ভূমিকা স্বরূপ 'কোপাই' কবিতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভিপ্রায়কে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কাব্যের এলাকাকে প্রসারিত করে সমস্ত বাস্তবকে তার অন্তর্গত করে নেওয়ার আগ্রহের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হ'য়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন পদ্মার প্রতিবেশী, সেই কারণে তাঁর পূর্ব পর্বের কাব্যকে তিনি পদ্মার সঙ্গে তুলনা করেছেন, —

বিমুখ তার আভিজাত্যিক ছন্দে
এক দিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর - এক দিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।

উত্তর - জীবনে কবি শান্তিনিকেতনে কোপাই নদীর প্রতিবেশী, যে নদীর পদ্মার মতো প্রাচীন স্রোতের গরিমা নেই। এই নদীর ভাষা গৃহস্থ পাড়ার ভাষা, তাকে সাধুভাষা বলা চলে না। তেমনি —

কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিল,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে,
যেখানে ভাষার গান আর যেখানে ভাষার গৃহস্থালি।

****

১২। রবীন্দ্ররচনাবলী - চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৫২২।
১৩। রবীন্দ্ররচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা - ৫২৯।

তার ভাঙা তালে হেঁটে চলে যাবে ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে ,
পার হয়ে যাবে গোরুর গাড়ি
আঁটি আঁটি খড় বোঝাই করে ,
হাটে যাবে কুমোর
বাঁকে করে হাঁড়ি নিয়ে ,
পিছন পিছন যাবে গাঁয়ের কুকুরটা ,
আর, মাসিক তিন টাকা মাইনের গুরু
ছেঁড়া ছাতি মাথায় ।

— কোপাই (১ ভাদ্র ১৩৩১)।

গদ্যছন্দে রবীন্দ্রনাথ আনতে চেয়েছেন চিরকালের স্তব্ধতার সঙ্গে চলতিকালের চাঞ্চল্য । সেই বাস্তবময় ছন্দে —

সুশ্রী - কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে ।
ছেঁড়া কাঁথা আর শাল - দোশালা
এল জড়িয়ে মিশিয়ে ,
সুরে বেসুরে ঝনাঝন ঝংকার লাগিয়ে দিল ।
গর্জনে ও গানে , তাণ্ডবে ও তরল তালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ ।

— নাটক (৯ ভাদ্র ১৩৩১)

এই সম্পর্কে প্রমথ নাথ বিশী খুব চমৎকার ভাবে বলেছেন ,—

"গদ্যছন্দ আর কিছুই নয়, যুগছন্দ আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা । প্রত্যেক যুগ একটি বিশেষ ছন্দের অপেক্ষা রাখে । . . . পরিবর্তন অতিশয় দ্রুততর । এ যেন সমস্ত মানবসমাজটা উপুড় হইয়া পড়িয়া গিয়া সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে ।

গুরুশিষ্য - দ্বিজ চণ্ডাল শুচি অশুচি একত্র জড়াজড়ি। বিচিত্র ইহার অপ্রত্যাশিত বিন্যাস। পারিজাতের শাখা ও দাঁতন কাঠি, উর্বশী ও উদরী, তুলসী ও পাতিলেবু, বিষ্ণু ও বোনাম পাশাপাশি শায়িত, ধর্মনীতি, বিবেক, মিথ্যা চুরি ও কালো-বাজারী এমন মিশিয়া গিয়াছে যে, নিতান্ত সদিচ্ছাবানেরও নির্বাচনে ভুল হওয়া স্বাভাবিক, এই বিচিত্র জীবনপ্রবাহে হরিপদ কেরানীর ছেঁড়া ছাতা ও আকবর বাদশার রাজছত্র পাশাপাশি ভাসিয়া যায়, আর কবির কলম নক্ষত্রসন্ধান ছাড়িয়া কোলাব্যাঙ ও নেড়ি কুত্তাটার সংবাদ না লইলে মুক্তি পায় না। . . . সমস্ত দেশের কবি-মনীষীরা মুক্তছন্দ সন্ধানে নিযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই মুক্তছন্দ আবিষ্কারের প্রথম প্রচেষ্টা।" ১৪

রবীন্দ্রনাথ নিজেও সচেতন ছিলেন মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দ উদ্ভাবন করে পয়ারের বন্ধন থেকে যে প্রথম ছন্দমুক্তি ঘটিয়েছিলেন তারই চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে গদ্যছন্দের কবিতা। মধুসূদন যথেচ্ছ যতিপাত করে পয়ারের একঘেয়েমীর মধ্যে শিথিলতা সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু মধুসূদন প্রতি চরণে চোদ্দ মাত্রার বাধ্যতা বজায় রেখেছিলেন। সেই বাধ্যবাধকতা রবীন্দ্রনাথ প্রথম ভাঙলেন বলাকা ছন্দে। বলাকা কাব্যের চরণ অসমমাত্রিক। কিন্তু বলাকাতে পয়ারের একটা উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল দেখেছি। পয়ারের প্রত্যেকটি পূর্ণ পর্ব আট মাত্রার। বলাকার ছন্দে রচিত কবিতারও প্রত্যেকটি পূর্ণ পর্ব আট মাত্রার,–

রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য - উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।

– ৭ সংখ্যক কবিতা, বলাকা

****

১৪। রবীন্দ্র - সরণী - শ্রী প্রমথনাথ বিশী, মাঘ, ১৩৮০, পৃষ্ঠা – ২৪৯ - ৫০।

কিন্তু গদ্যছন্দে সেই আট মাত্রার পূর্ণ পর্বও সর্বত্র বজায় থাকেনা । গদ্যের ছন্দ বাক্যের অর্থকে অনুসরণ করে । নিয়মিত ছন্দে যতি দুই প্রকার — হ্রস্ব যতি ও অর্ধ যতি । কিন্তু গদ্য ছন্দে একমাত্র অর্ধ যতি । তাই গদ্যছন্দের একটি কবিতাকে ডঃ সুকুমার সেন যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা উদ্ধার করলে ব্যাপারটি সহজেই বোঝা যাবে ।[১৫]

বাঁশিওয়ালা , ।
বেজে ওঠে । তোমার বাঁশি , ।
ডাক পড়ে — অমর্ত্যলোকে , ।
সেখানে — । আপন মহিমায় ।
উপরে উঠেছে । আমার মাথা ।
সেখানে — কুয়াশার । পর্দা - ছেঁড়া ।
তরুণ - সূর্য । আমার জীবন ।

সমাজ বাস্তবের অভিঘাতে 'পুনশ্চ' ও তার পরবর্তী কবিতায় এমন ভাষা ব্যবহৃত হ'য়েছে যাকে আভিজাত্যিক সাধুভাষা বলা চলে না , তার ভাষা 'গৃহস্থ পাড়ার ভাষা'। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে — 'ঝাটপাট খেতে ওদের ছাগল চরে', 'ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে', 'তিন টাকা মাইনের পুরু', 'ছেঁড়া ছাতি মাথায়', 'কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি লোকে , 'কবিতাকে পাঠকের অভিসারে যেতে হয়' 'পটল - ডাঙার অধিবাসে চড়ে'। গজনে যেহেতু খাদ্য সেন্টিমেন্ট কবিতার আসনে গজনের স্থান নেই একথা যে রবীন্দ্রনাথ বলেন তিনিই ব্যবহার করেন ,—

* *

১৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ সুকুমার সেন , তৃতীয় খণ্ড , ১৩৭৬ ,
পৃষ্ঠা - ১১৯ ।

তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে ,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে ।

— পুকুর ধারে, পুনশ্চ ।

এছাড়া পুনশ্চ পর্বের কবিতায় এসে যায় অনেক অমার্জিত প্রসঙ্গ । কবিতায় এসে যায় — বিশেষ করে সেই ছেলেটার কথা —

ছেলেটা কুল পাড়তে গিয়ে গাছের থেকে পড়ে ,
হাড় ভাঙে ,
বুনো বিষফল খেয়ে ওর ভির্মি লাগে ,
রথ দেখতে গিয়ে কোথায় যেতে কোথায় যায় ,
কিছুতেই কিছু হয় না ,—
আধমরা হয়েও বেঁচে ওঠে ,
হারিয়ে গিয়ে ফিরে আসে
কাদা মেখে কাপড় ছিঁড়ে ,
মার খায় দমাদম ,
গাল খায় অজস্র ,
ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড় ।

— ছেলেটা , পুনশ্চ ।

'চৌকিতে লাগিয়ে রেখেছিল ভুসো', 'নস্যি ডাক্তারটা জবাব করলে', 'কোলাব্যাঙ তুলে ধরে খপ করে', 'একদিন একটা হেলে সাপ রাখলে মাস্টারের ডেস্কে,' 'নেড়ি কুকুরের ট্র্যাজেডি' ইত্যাদি শব্দ ও বাক্য রবীন্দ্র কবিতায় দেখা যেতে থাকলো । এসে গেলো সেই সহযাত্রীর কথা যার দাড়িগোঁফ কামানো মুখে অনাবৃত হয়েছে বিধাতার শিল্প রচনার অবহেলা , যার মেলামেশা চাটগাঁয়ের খালাসিদের সঙ্গে । অসাধারণ মেয়ে নয় — সাধারণ মেয়ে আজ রবীন্দ্র কবিতার প্রসঙ্গ , যেমন কবিতার প্রসঙ্গ কোনো

অভিজাত পাখী নয় – নিতান্ত শালিখ । একজন নির্বুদ্ধি নামহীন আধবুড়ো হিন্দু-স্থানির কথা বলতে তাঁর কবিতা আজ আর কুণ্ঠিত হয় না ।

যেমন ছন্দে , যেমন শব্দে , যেমন বিষয় নির্বাচনে , তেমনি উপমাতেও বাস্তবতার এই অভিঘাত স্পষ্টই লক্ষ করা যায় ,–

(১) মাঝে মাঝে মরচে ধরা কালো মাটি । মহিষাসুরের মুণ্ড যেন ,

(২) কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য ,

(৩) মোটা মোটা কালো মেঘ । ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন ,

(৪) কৃষ্ণপক্ষের ক্ষুণ্ণ চাঁদ যেন রোগশয্যা ছেড়ে । ক্লান্ত হাসি নিয়ে গগনে বাহির হয়ে এল ,

(এ কি সেই এলিয়টের বিখ্যাত সূর্যাস্ত বর্ণনার প্রতিধ্বনি – Like a Patient etherised upon a table "?),

(৫) ছাতার অবস্থাখানা জরিমানা - দেওয়া । মাইনের মতো, । বহু ছিদ্র তার ,

(৬) বাদলের কালো ছায়া । স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে । কলে - পড়া জন্তর মতন । মূর্ছায় অসাড় ।

'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থের 'মানবপুত্র' কবিতায় যন্ত্রণাকাতর ঐতিহাসিক চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত 'উদ্যত শেল ও শল্য', 'চতুর ছোরা ও ছুরি', 'ফলায় শান দেওয়া', 'হিসহিস শব্দ', 'মৃত্যুবাণ', 'নরঘাতকের হাতে' প্রভৃতি শব্দে এ যুগের যন্ত্রণার কথা প্রকাশিত । এই ইতিহাসবোধের বেদনার্ত রূপটি আরও গভীর অর্থবহ হ'য়ে উঠেছে 'একটা অস্ফুট ধ্বনিধারা বিসর্পিত', 'শতকস্রোত', 'পরশ্রীকাতরের কানাকানি', 'কুৎসিত জনশ্রুতি', 'অবজ্ঞার কর্কশহাস্য', 'বিভীষিকার উল্কি পরানো' প্রভৃতি শব্দ , বাক্যাংশ ও চিত্রকল্পের মধ্য দিয়ে 'শিশুতীর্থ' কবিতায় । এই কবিতাতেই কোথাও কোথাও হালকা অথচ অর্থবহ শব্দ ও বক্তব্য যেমন 'বৈরিতা', 'নারীতে সন্দেহ', 'গ্রামগুলো নোংরা' প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সমাজে মানুষের স্বার্থপরতা ও

ও দলাদলির রূপটি পরিস্ফুট । আবার 'সাধারণ মেয়ে' (পুনশ্চ) কবিতায় 'বড়ো দুঃখ তার' এই একটি সাধারণ বাক্যকে ঘিরেই সমাজজীবনে নারীর স্বাধীন সত্তা - সম্পর্কিত কিছু অন্তর বেদনার প্রসঙ্গ আবর্তিত । এ ছাড়া 'নোনা - ধরা দেওয়াল', 'স্যাঁতা - পড়া দাগ', 'বেতন পঁচিশ টাকা', 'খেতে পাই দত্তদের বাড়ী । ছেলেকে পড়িয়ে', 'কলে - পড়া জন্তুর মতন'(বাঁশি , পুনশ্চ) , 'ডুবেছে দিয়েছে খেটে', 'জুতোটার তলা ছেঁড়া' (উন্নতি,। পুনশ্চ) – এই সব বক্তব্যে ও শব্দচয়নের ভেতরে আছে বাঙালী নিম্ন মধ্যবিত্ত কেরাণী জীবনের যন্ত্রণা ও তার বেদনার ইতিহাস । অস্পৃশ্যতাকে কবি সমাজজীবনের কলঙ্ক বলেই জেনেছেন । কাজেই তাকে অতিক্রম করে মানববোধে উদ্দীপিত হোক মানুষ - অন্তর এই বক্তব্য কবি তাঁর কবিতায় সংক্ষিপ্ত সহজ অথচ নিগূঢ় অর্থবহ ভাষায় তুলে ধরেছেন । 'পুনশ্চ'-র কবিতাতেই আছে ,– 'লোকশিক্ষিত রূপ, করতে হবে যে শুদ্ধ', 'রাজবাড়ির ঠাকুর ঘর শূন্য', 'এতক্ষণে মিলল তাঁর দর্শন', 'তোমার ললাটে আর আমারি ললাটে । মন্দিরে আর হবে না যেতে' । আবার এমনতরো বক্তব্য 'পত্রপুটে'র 'পনেরো' সংখ্যক কবিতায়ও আছে । যেমন – 'ওরা অন্ত্যজ , ওরা মন্ত্রবর্জিত'।

'মহুয়া'র মতোই 'বিচিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থটিতে 'রাতের প্রহর গণি', 'কুৎসিত ডাকাতরে', 'বন্দীশালার দ্বারে' (কুমার, মহুয়া) প্রভৃতি শব্দ ব্যঞ্জনার ভেতরে এবং সমাজব্যবস্থায় নারীর সঙ্কটাবস্থা ও তার জীবনের জয়ধ্বনির প্রসঙ্গ উত্থাপিত । এই ধরণের শব্দ আরো আছে । – 'বিজয়রথ', 'মুক্তির আধরণী', 'শঙ্খ', 'জয়ধ্বনি' ('প্রকাশিতা', মহুয়া) নববিবাহিতা নারীর সজ্জিত রূপের মধ্যেই সমাজের নীতিনিয়মের চাপে নিপীড়িতা , সঙ্কুচিতা নারীর মূর্তিটিও যেন সচকিতে ধরা পড়ে যায় —

আজ তুমি রাঙাচেলি দিয়ে মোড়া
আধাপোড়া ,
জড়োসড়ো ঘোমটায় - ঢাকা
ছবি যেন পটে আঁকা । –

– প্রকাশিতা, বিচিত্রিতা ।

আবার রাজার রণযাত্রার চিত্রটিও 'যাত্রা' (বিচিত্রিতা) কবিতাটির সম্পদ , –

রাজা করে রণযাত্রা ,
বাজে ভেরি , বাজে করতাল ,
কম্পমান বসুন্ধরা ।
বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার - ভাঁটায় ।
পণ্যপোত
ধায় সিন্ধুপারে - পারে ।

এই রণযাত্রার মধ্য দিয়েই তৎকালীন ইংরেজ রাজের দোর্দণ্ড প্রতাপের চিত্র উদ্ঘাটিত । আপন জীবন সমীক্ষায় ধ্যানরত কবি রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস চেতনার রশ্মিজালে নিজের অতীত ও বর্তমান জীবনবোধের যন্ত্রণা – 'পায়ে বিঁধেছে কাঁটা', 'ক্ষত বক্ষে পড়েছে রক্তধারা', 'নির্মম কঠোরতা মেরেছে ঢেউ' ('শেষ সপ্তক'), 'কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া', 'রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ' (পত্রপুট, বারো সংখ্যক) প্রভৃতি অর্থবহ বাক্যাংশে ও শব্দে গেঁথে গেঁথে তুললেন । আর এই লাঞ্ছিত যন্ত্রণার পাশাপাশি আলোর সংকেত 'আশীর্বাদ' শব্দে বিভাসিত হ'য়ে উঠলো । দেখা যায় সংগ্রামী মানসী শক্তির প্রতি কবির আকর্ষণ বিভিন্ন কবিতায় বার বার 'বীর' শব্দ প্রয়োগের মধ্যে প্রতিধ্বনিত ।

'বীথিকা'র "বিদ্রোহী" কবিতায় কঠোর সংগ্রামের পথেই জয়ের আশ্বাস ভরে দিলেন রবীন্দ্রনাথ 'কবির কঠোর বীর্যে জয়', 'শান্তির বিদ্রোহ' প্রভৃতি বাক্যে । 'দস্যুবৃত্তি দুর্গম' , 'আশাহারা বিচ্ছেদের তাপ', 'অকিঞ্চন অদৃষ্ট' , 'ভিক্ষুকের মোহ'এই সমস্ত শব্দ ও ভাষা সমাজের ও জীবনের জড় অবস্থারই প্রতিরূপ । এ ছাড়া দৈন্য , ঈর্ষা , কুৎসা , কলুষ , ক্লেদপঙ্ক , কাপুরুষ ইত্যাদি শব্দও এই অর্থেই বার বার এই অধ্যায়ের বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে স্থান পেয়েছে । 'রুদ্র'র প্রসঙ্গও এসেছে বারবার । রুদ্রের কাছে অন্যায়ের বিনাশ প্রার্থনায় মহাকালের তাণ্ডব - নৃত্যের চিত্রটি আভাসিত হ'য়ে ওঠে , –

তাণ্ডব নৃত্যের ভরে
দুর্বলেরে যে - গ্লানিরে চূর্ণ কর যুগে যুগান্তরে
কাপুরুষ নির্জীবেরে যে নির্লজ্জ অপমানগুলি
বিলুপ্ত করিয়া দিক উৎক্ষিপ্ত তোমার পদধূলি ।
— কলুষিত , বীথিকা ।

মনুষ্যহীন , বীর্যহীন হীনতা সমাজে যে ধুলো বয়ে আনে তাকে কবি গর্ত - খোদা ভয়ঙ্কর কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ঝিঁঝিগণের সঙ্গে তুলনা করে বাস্তব রূপটিকেই তুলে ধরেছেন । এই বাস্তব নানাভাবে কবিতায় সর্বত্রই মূর্ত হয়ে ওঠে । বাঙালী নারীমনের অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার প্রতি আকর্ষণ এবং তাকে দুর্গম সংগ্রামপথে টেনে নিয়ে যায় বাস্তবের দুর্যোগ — ঝড়ের ডাক , বন্যার ডাক , আগুনের ডাক , মরণসাগরের ডাক , শিকল - নাড়া উদাসী - হাওয়ার ডাক (বাঁশিওয়ালা, শ্যামলী)। এই সমস্ত ভাষা ও শব্দমূর্তির মধ্যে উপ্ত রয়েছে সমাজে অবহেলিতা নারীর স্বাধীন ভাবনা তার তার প্রেমের কথা এবং তার আপন মহিমময় শক্তির প্রাচুর্য । নারী - পুরুষের প্রেমের প্রসঙ্গে ভারতীয় পৌরাণিক উপমা টেনে পুরুষের পৌরুষকে একটু বাঁকা নজরেই যেন দেখলেন কবি (অমৃত , শ্যামলী) । রবীন্দ্রনাথ এসময়ই সমাজ এবং বিশ্বমানবের চিন্তায় বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন । তাই 'পুনশ্চ' থেকেই দেখা যায় কবিমন অতিমাত্রায় বাস্তব-ঘেঁষা হ'য়ে উঠেছে ভাষায় , ছন্দে , শব্দে এবং বক্তব্যে । 'রাশিয়ার লগ্নী খোদানে বাদুড়টা' (অমৃত , শ্যামলী) এই বাক্যটির ভেতর দিয়ে রাশিয়ার রাজনীতি ও সমাজনীতির প্রসঙ্গটিই কৌশলে উত্থাপিত হয়েছে । আর সেকালের ভারতীয় যুবকদের যে-কোনো উপায়ে বিলাতযাত্রার প্রতি অত্যধিক আকর্ষণকে তুলে ধরলেন কবি একটিমাত্র চরণে (অমৃত, শ্যামলী) ,— 'প্রয়োজন ছিল সুগম করতে বিলাতযাত্রার পথ' ।

সাম্রাজ্যবাদী - ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলির অত্যাচার লোভ , শঠতা এবং একই সঙ্গে অত্যাচারিত আফ্রিকার প্রতি সহানুভূতি 'পত্রপুটে'র 'ষোলো' সংখ্যক কবিতায়(আফ্রিকা)রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন । সাম্রাজ্যবাদী ইয়োরোপীয় হিংস্র শক্তির সঙ্গে আফ্রিকার অরণ্যের হিংস্র নেকড়ের তুলনা টেনে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকার হিংস্র নেকড়ের

নাথকে অপেক্ষাকৃত কম তীব্র ও হিংস্র বলে চিহ্নিত করলেন। তার এই সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সর্বাধিনায়কেও আফ্রিকার মূর্তিহারা অরণ্যের সঙ্গে তুলনায় অনেক বেশী নম্র মনে হয়েছে কবির। দেখা যায়, বক্তব্যের উপযোগী ভারী শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ বেশী ব্যবহার করেছেন কবি এই পর্বের কবিতায়।

ধ্বনিগত ছন্দের আড়াআড়াতে রেখে রবীন্দ্রনাথ 'পুনশ্চ'কাব্যে 'অসংকুচিত গদ্যরীতি'তে কবিতা লিখলেন তার 'পত্রপুট' গ্রন্থে এর পূর্ণ বিকাশ ঘটালেন। এই গদ্য কবিতার বাহ্যপর্ব গদ্যরীতির মধ্যেই এক একটি ভাবের পর্ব আর গদ্যেরই ভাবগত যতি, অন্বয়, প্রভৃতি ইত্যাদি সুরক্ষিত হ'লো অনেক বেশী পরিমাণে। রবীন্দ্রকাব্যে বার বার ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে রীতি পরিবর্তনও অনিবার্য হ'য়ে উঠেছে দেখা যায়। 'মহুয়া' থেকে 'শ্যামলী' পর্যন্ত এই অধ্যায়ের আলোচিত সমাজ সম্পর্কান্বিত কবিতাগুলোর যে ভাববস্তু তাতে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সমাজের এবং জীবনের নানাবিধ জড়তা, অন্ধতা, কুসংস্কার ও যন্ত্রণার প্রসঙ্গ তুলে ধরে যে সবের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছেন। আবার একই সঙ্গে এই সমস্ত অবস্থাকে অতিক্রম করে যাবার শক্তি ও সাহস যুগিয়েছেন সমাজে, দেশে, বিশ্বে এককথায় জীবনের সর্বত্র।

সমকালীন রাজনৈতিক এবং সামাজিক ঘটনার প্রত্যক্ষ ছায়াপাত প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের শেষ দুটি কবিতা ছাড়া অন্য কবিতাগুলোতে নেই বললেই চলে। সমালোচকেরা একমত যে মৃত্যুর আসন্নতাকে রোগজর্জর কবি এ কাব্যের মধ্যে রূপায়িত করেছেন। তাই সমালোচকের অভিমত, —

'একটিমাত্র অভিজ্ঞতার শিলাখণ্ডে গঠিত বলিয়া কাব্যখানি আকারে ক্ষুদ্র, আয়ত্তে সংক্ষিপ্ত, ভাবে সংহত, অন্যান্য কাব্যে যেসব ভাবে অনু পরমাণু শিথিলবন্ধ বলিয়া নৃত্য করিবার সুযোগ পাইয়াছে, দারুণ অভিজ্ঞতার চাপে এখানে তাহা ঘনীভূত অবস্থায় দৃঢ়শিলাবদ্ধ প্রস্তরখণ্ডে পরিণত। কবিতাগুলির ভার যেন হাতে অনুভূত হইতে থাকে। তুলনায় আরোগ্য - ও রোগশয্যায় - ভুক্ত কবিতাগুলি লঘুভারযদিচ তাহাদের

মূলেও আছে আসন্ন মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।' [১৬] কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অবলুপ্তির সম্ভাবনাতে প্রান্তিকের অন্ধকারময় পঙ্‌ক্তিগুলি প্রস্তরীভূত রূপ নেয়নি। যে মৃত্যুদূত যুগে যুগে এসে বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে সে শুধু কবির দিকে তার ভয়ঙ্কর হাত প্রসারিত করেনি, সে যেন সমগ্র বৈশ্বিক সভ্যতার দিকে তার হাত প্রসারিত করেছে। এই কাব্যের মধ্যে একটি অ্যাপোক্যালিপটিক্ ভিশন বা এক প্রলয়ের দিব্যানুভূতি যেন প্রকাশ পেয়েছে। কবি যেন অনুভব করছেন যে সমস্ত বিশ্বসভ্যতার উপরে এক যবনিকা নেমে আসতে উদ্যত হ'য়েছে। ব্যক্তিগত মৃত্যুর সম্ভাবনা এই 'প্রান্তিক কাব্যে প্রধান হ'লেও ব্যক্তিগত এখানে বিশ্বগত হ'য়ে উঠেছে। আর এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত অনুমান নয় তার প্রমাণ শেষ দুটি কবিতা। এমন কি যেগুলো সংখ্যক কবিতায় যখন কবি পুরাণে কীর্তিত কত দেশের কীর্তিস্তম্ভের কথা বলেন, অতীতের দর্পোদ্ধত প্রতাপের ভগ্নদশার কথা বলেন তখন সন্দেহ হয় অতীত সভ্যতার মতো বর্তমান সভ্যতার বিনষ্ট - সম্ভাবনা তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করেছে। ইয়োরোপে ফ্যাসীবাদের জয়যাত্রা এক রক্তাক্ত অন্ধকার যুগের সূচনা করেছে। সেই শিশুঘাতী নারীঘাতী কুৎসিত বীভৎসা যেন বিশ্বসভ্যতার উপর এক অন্ধকার পর্দা টেনে দিয়েছে। ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত প্রলয়ের সম্ভাবনা এই 'প্রান্তিক' কাব্যে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে। তার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন রূপরীতিতে কিছু বিগত পদ্ধতি। ব্যবহার করেছেন অনেক অপরিচিত তৎসম শব্দ — অবলিপ্ত, চিত্রভানু, তমিস্র, দ্রাবক, দেহলীন্, পৃষন্, বীভৎসা প্রভৃতি। এছাড়া ব্যবহার করেছেন অনেক তৎসম শব্দের সমাসবদ্ধ রূপ — নবনাট্যভূমে, স্তম্ভিতরিক্ত, কারা প্রাচীর বেষ্টন, বিশ্বশিল্পিবিধানসম, উচ্ছ্বসিত - সম্পিক্ত, অরুণকিরণতলে, আদিনির্ঝরতলায়, পূর্ব - হিমগিরিসংবীত, শুকতারা - নিমন্ত্রিত, সর্ব - আবর্তনাগ্রাসী, মুগ্ধচ্ছবি - মুছে - যাওয়া, কলরব মুখরিত ইত্যাদি। অমিল প্রবহমান মহাপয়ারে লিখিত হলেও এই কাব্যের পঙ্‌ক্তিগুলিতে গতি নেই। সমাসবহুল, তৎসমশব্দবহুল ভাষাকে যেন খোদাই করে করে এই

* *

১৬। রবীন্দ্র - সরণী - শ্রী প্রমথনাথ বিশী, চতুর্থ মুদ্রণ, মাঘ ১৩৮০, পৃষ্ঠা - ২৭১।

অন্ধকারময় কাব্যের ভাস্কর্য্য কবি নির্মাণ করেছেন । আর তারই মধ্যে যেন আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জমাটবদ্ধ প্রলয় সম্ভাবনাকেও কবি তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বিধৃত করে তুলেছেন । এই দেখা আর তার বিরুদ্ধে কবির সশব্দ বিদ্রোহ-ই যে জেগে উঠলো প্রান্তিকের সতেরো ও আঠারো সংখ্যক কবিতায় । দুটির অংশবিশেষ যথাক্রমে উদ্ধৃত হ'লো , —

(ক) * * * দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা , দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ । * * *
* * * এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুঙ্কারিয়া নরমাংস ক্ষুধিত শকুনি ,
আকাশেরে করিল অশুচি । মহাকাল সিংহাসনে —
সমাসীন বিচারক , শক্তি দাও , শক্তি দাও মোরে ,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী , * * *

(খ) নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস ,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস —
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই

উল্লিখিত কবিতাদ্বয়ে এই বিদ্রোহাত্মক ভাবের উপযোগী কঠিন ও প্রত্যয়দৃঢ় শব্দ চয়নেও কবি তাই হলেন তৎপর । প্রান্তিক কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির ভাব অন্তর্গূঢ় ও প্রগাঢ় । ভাষা সংহত এবং ছন্দে আছে বিলম্বিত লয় । এ ছাড়া প্রাচীনরীতির ক্রিয়াপদের ব্যবহারও ঘটেছে । বিষয় , ছন্দ এবং ভাষার দিক থেকে সেঁজুতি এবং আকাশপ্রদীপের অনেক কবিতা পলাতকার ধরণে লেখা । ভাষা 'পুনশ্চ' যুগের কবিতার মতোই গৃহস্থ পাড়ার ভাষা । ছন্দ অনেক ক্ষেত্রেই 'পলাতকা'র মতো দলবৃত্ত বা

শ্বাসাঘাত প্রধান এবং 'পদাতিক'র মধ্যেই প্রবহমান সেঁজুতি এবং আকাশ প্রদীপের বেশীর ভাগ কবিতার ছন্দ। এই দু'টি কাব্যের আঙ্গিকগত বিশেষ কোনো স্বকীয়তা নেই। তবুও দেখানো যেতে পারে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গকে কিভাবে তিনি এ দুটি কাব্যে রূপায়িত করেছেন। কখনো কখনো সেই রূপায়ণে লক্ষ্য করা যায় 'প্রান্তিকের' ধরণ, — যেখানে তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দের মধ্য দিয়ে কবির প্রলয়চিন্তা সংহতভাবে রূপলাভ করেছে। 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মদিন' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, —

শুনি তাই আজি
মানুষ - জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, এ প্রহসনের
মধ্য - অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের,। আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'

আবার কোনো কোনো কবিতায় ধরা পড়ে 'নবজাতকে'র পূর্বাভাস,—

যুদ্ধ লাগল স্পেনে,
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ - মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্র গরুড়রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে।
— চলতি ছবি, সেঁজুতি।

হালকা ভঙ্গীতে লেখা 'প্রহাসিনী'র কবিতায় নারী প্রগতিমূলক ঘটনাসমূহের বিশেষ প্রভাব স্পষ্টতই লক্ষ করা যায়। পরিহাসময় এই কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা রচনাভঙ্গীর গুণে এক কৌতুকময় লঘুত্ব লাভ করেছে। উদ্ধৃতি সহযোগে সেই পথটির স্পষ্ট পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে —

মেয়েরাও বই যদি নিতান্তই পড়ে
মন যেন একটু না নড়ে।
নূতন বই কি চাই। নূতন পঞ্জিকাখানা কিনে
মাথায় ঠেকায়ে তারে প্রণাম করুক শুভদিনে।
আর আছে পাঁচালির ছড়া,
বুঝিতে জাগাবে জেদের ন্যাশনাল কালচারের দড়া।
দুর্গতি দিয়েছে দেখা, বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি-এ এম-এ পাস করে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-ঘাসা ঘোর ম্লেচ্ছ তার।
ধর্ম কর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়েরে করে হেলা,
বসন্তের টিকা নেয়, 'গ্রহণের বেলা
পরান্নানে পাপ লাগে'
শুনিয়া মূর্খের মতো হাসে।
— নারীর কর্তব্য, প্রহাসিনী।

এই কাব্যগ্রন্থে হালকা ভঙ্গীর উপযোগী নতুন অপ্রচলিত শব্দ যেমন — কিরিপিরি, যমরথচক্রের কর্দম, স্লিপারে বা নূপুরে, একাকার ইত্যাদি ব্যবহৃত হ'লো। আরও দেখা গেলো যে ইংরেজী শব্দের প্রচুর ব্যবহার — প্রোটন এবং ইলেকট্রনের, প্রুফ-করেকশনে, প্রোলিটেরিয়েটের, রেলোটাইজাট, কনফুশান, স্লিপার, মিনিকাল, ইম্পুটিশন, টিকেট, রেলেটিভ, এক্‌জামিনেশন, ডিফারেন্স্, ফিলজফার, ইস্টাম্পের, ভিজিটর্, অটোগ্রাফ, আর্টিস্টিক, রেজিস্টারি, মেজেন্টার, রিয়ালিস্টিক ইত্যাদি এবং ইংরেজী শব্দকেও সরাসরি

Party ,Merry ,Shelter ,Flatter — এইভাবে ব্যবহার করেছেন কবি। কবিতায় মিল স্থাপনের ক্ষেত্রে বেশ নতুনত্ব দেখালেন কবি, — কালিদাস - বররুচি - আদিরা। প্রশস্তিবাদীরা, হেন কাল ছিল না। কাব্যানুশীলনা, কলসি ও দড়ি আনু। ঘিড় - ভিক্টোরিয়ান, তিনকাল। মিনিকান, মধু দিয়ে। Chinese Tea - যে, খান তিন। ভিটামিন, Exaggerate - । সত্য নিরেট, দুয়ার থাকে বন্ধ। অনিল চন্দ ইত্যাদি।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমাজবাস্তবের প্রভাবে রবীন্দ্রকবিতা আঙ্গিকগত পরিবর্তনের আর একটি নতুন স্তরে উত্তীর্ণ হয় 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে এসে। অমিয় চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি' প্রসঙ্গে তাঁর 'সাম্প্রতিক' গ্রন্থে বলেছেন,—

'জীবনের যা রূঢ় তাকে বাদ দিয়ে দেখেননি, সংসারের সংগ্রাম এবং শান্তি একই ছবিতে বিধৃত হয়ে তাঁর মনে উদ্ভাসিত হ'য়েছে। বাংলার নদী - ঘাট, ধানক্ষেত, মেঘভারাবনত আকাশ, রৌদ্রভাসিত প্রতিদিনের কর্মের সংসার ছবির পরে ছবি হয়ে তাঁর কবিতায় দেখা দিচ্ছে। "নবজাতক"- এর কাব্যে তিনি দেখছেন প্রাচীন হিন্দুস্থানকে, রাজপুতানাকে, চীন এবং য়ুরোপের মহাদেশকে। মানুষের দুঃখ তরঙ্গিত সমরায়ন তাঁর আকাশে দেখা দিয়েছে জাতীয় অসাম্যের ভূমিকায় — বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি একই মধ্যে ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে প্রযুক্ত ক'রে আজকের সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন। মানচিত্রের মতো মহাজাতির প্রসারিত পট খুলে গেছে তাঁর মানসের সম্মুখে। তা ছাড়া "নবজাতক" — এ দেখেছি আধুনিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক বাহন রেলগাড়ি, স্টেশন, সহরের নাগরিক জীবনের ঘরবাড়ি ও তাঁর কাব্যদৃষ্টির অন্তর্গত। যে - সব প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় সচরাচর স্থান পায়নি, খোলা চোখের কাব্যে তারাও আর বাদ পড়ল না। একেই তিনি "নবজাতক" - এর একটি কবিতায় বলেছেন 'বিশুদ্ধথা'।' [১৭]

****

১৭। সাম্প্রতিক : রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি, অমিয় চক্রবর্তী যে, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা - ১৭৮।

অমিয় চক্রবর্তী উক্ত প্রসঙ্গেই আরও বললেন ,— 'রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিকারীভেদ নেই , এখানে সকলেরই নিমন্ত্রণ । মাঝি এল তাঁর পালতোলা নৌকো নিয়ে , গঞ্জের হাট থেকে লোক এল বিবিধ পসরা হাতে ক'রে — কেউ হালে বলদ জুতেছে , কেউ বা শহরে কাজ করে দোকানে বা অফিসে । কত ঘরের নিভৃত কাহিনী জীবনের ধ্যানমালায় গ্রথিত হ'ল তাঁর আজকের কবিতায় ।' [১৮]

নিরলঙ্কার , বিরলসৌন্দর্য সুস্পষ্টায়ণে সম্পূর্ণ নবজাতকের কবিতাগুলি । দৃষ্টিভঙ্গির নূতনত্ব রয়েছে কবিতাগুলির বিষয়বস্তুর মধ্যেই। একান্তভাবেই বর্তমান যুগের নানাবিধ প্রসঙ্গ এবং তার উপযোগী শব্দ ও উপমা চয়ন — নতুন সৃষ্টির আগুন লক্ষ্য করা যায় এই কাব্যগ্রন্থের কবিতায় । বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার এরোপ্লেনের মধ্যে কবি পশ্চিমী যন্ত্রশক্তির তার অশান্ত স্পর্ধা দেখতে পেলেন । এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য 'নবজাতকে'র পক্ষীমানব কবিতাটি । সেখানে জেগে উঠলো দিকে দিকে দারুণ বিভীষিকা ,—

ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
ভাষাহীন বিভীষিকা ।

বর্তমান সভ্যতার পাপের ও ধ্বংসের রক্ত কলঙ্কিত রূপের উপরে রবীন্দ্রনাথের দুঃখ মনের অভিশাপ তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থে বারে বারেই উচ্চারিত হয়েছে । 'প্রান্তিকে'র ইতিহাসচেতনা 'নবজাতকে' আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে । বর্তমানের কলুষিত সভ্যতার ধ্বংস যেমন রবীন্দ্রনাথ কামনা করেছেন তেমনি একই সঙ্গে নতুন সৃষ্টির উপরে বিশ্বাসের সুর তিনি ধ্বনিত করে তুলেছেন — এ ঘটনাও রবীন্দ্রকবিতায় সর্বদাই ঘটেছে । তবু যেন মনে হয় এ সমস্তই রবীন্দ্রজীবনদশার শেষ পর্বের কবিতায় পৌঁছে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের শুভ্র জ্যোতিতে আরো দৃঢ় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ ।

* *

১৮। সাম্প্রতিক : রবীন্দ্রনাথের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি , অমিয় চক্রবর্তী , দে, ১৯৬৩, পৃষ্ঠা - ১৭১ ।

'নবজাতকে' পুরনো কাব্যরীতির শব্দ ও পদ খুব কম নেই । শ্রীযুক্তা সুনন্দা দত্ত দেখিয়েছেন যে , [১১] — শরণ , দোঁহে , বারতা জাতীয় কাব্যিক শব্দ এবং কুহরে , ঘন্দিছিল , আবর্তিয়া , গর্জিয়া , গুঞ্জি , কলুষিবে , জর্জরি , উচ্ছলি , জিনিবে , ফুৎকারিয়া ইত্যাদি পুরনো রীতির ক্রিয়াপদ এই কাব্যে বর্তমান । এরই পাশাপাশি 'প্রান্তিক' কাব্যের মতো সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দও এ কাব্যে পাওয়া যায় , তড়িৎ - আলো , তমস্তোরণ , ধন অশ্বরতন , কালীনাগিনী , বিপুলবীর্য , উৎকটদর্শন , যন্ত্রদানব , শাসনবীথি , দানবপদদলনে ইত্যাদিতে । আবার 'নবজাতকে'ই যে সমস্ত কবিতায় সমকালীন সময় ছায়া ফেলেছে সেখানে এমন জুগুপ্সিত বিষয়ের অবতারণা লক্ষীভূত হয় যা রবীন্দ্র কবিতায় অন্যত্র বিরল । যেমন —

বিষম দুঃখে ভ্রূণের শিশু
বিদীর্ণ হয়ে , তার
কলুষপুঞ্জ করে দিক উদগার ।
ধরার বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা ,
রক্তপিচ্ছিল লুব্ধ অধর
একদিন হবে ঢিলা ।
— প্রায়শ্চিত্ত , নবজাতক ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে আর কবির মনে হয়েছে 'বাণীকৌশলে' কবিতা রচনার দিন আজ বিগত । 'ভ্রূণের শিশু' - এর মতো শব্দগুচ্ছের মধ্য দিয়ে সাকার হ'য়ে ওঠে হিংস্র সভ্যতার প্রতি তাঁর বিবমিষা । কোনো কোনো সমালোচক যেমন

১১। রবীন্দ্রকাব্যভাষা , সুনন্দা দত্ত , ১৯৬১ , পৃষ্ঠা — ১৪১ ।

টিনিয়ার্ড কবিতাকে দু'ভাবে ভাগ করেছেন — ডাইরেক্ট এবং অবলিক । 'নবজাতকে'র কবিতা ডাইরেক্ট বা প্রত্যক্ষ কবিতা । কবিত তাঁর কবিতায় সরাসরি বলেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আসলে ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাত । তিনি পুরনো অভ্যাসমতো আশাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে লেখেন বটে 'নূতন জীবন নূতন আলোকে । জাগিবে নূতন দেশে" (প্রায়শ্চিত্ত, নবজাতক) কিন্তু রক্তপঙ্কে লিপ্ত ধরার মধ্যে কবি আশার কোনো উৎস যেন আর খুঁজে পান না । ইয়োরোপে এবং এশিয়া খণ্ডে যুদ্ধের ঘটনা কবিতার আঙ্গিকে যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ 'বুদ্ধভক্তি' কবিতা যার সমস্ত বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে একটি মর্মান্তিক বিদ্রূপ । অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত বুদ্ধদেবের কাছে সাম্রাজ্যবাদী জাপানী সৈনিকেরা গিয়েছে যুদ্ধ জয়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে । নিস্তব্ধ বুদ্ধের মন্দিরতলে —

> তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো ,
> ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো ।

ছন্দের কৌশলে এবং যুক্তধ্বনি ব্যবহারের ভেতর দিয়ে বুট পরিহিত সৈনিকদের সমবেত পদক্ষেপের ধাতব শব্দ যেন শোনা গেলো কবিতাটিতে । কলাবৃত্ত ছন্দে যুক্তধ্বনি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সৈনিকদের দর্পিত আচরণ যেন মূর্ত হ'য়ে উঠলো আর তারই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে সৈনিকদের পৈশাচিক আচরণের উপযুক্ত জুগুপ্সাময় শব্দ — দানবের খাদ্য , উৎকটদর্শন , কাটা - ছেঁড়া অঙ্গ , পৈশাচী রঙ্গ , বিষবাষ্প ইত্যাদি । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এরোপ্লেন থেকে বোমা বর্ষণ যেহেতু সবচেয়ে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে । সেই কারণে বিমানযুদ্ধের কথা বারে বারে 'নবজাতক' কাব্যে উপস্থাপিত । মারণাস্ত্র তৈরী করার উন্নততর কৌশল উদ্ভাবন ক'রে যারা সৈনিকদের রক্তপাতে সহায়তা করে সেই বিজ্ঞানীদের রবীন্দ্রনাথ প্রায়শ্চিত্ত কবিতায় হাড়গিলার সঙ্গে তুলনা করেছেন । যন্ত্রদানব এরোপ্লেন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 'মানবে করিল পাখি' (পক্ষীমানব)। ফলে জলে স্থলে যে যুদ্ধ সীমাবদ্ধ ছিল এখন তা আকাশেও প্রসারিত হ'লো । 'পক্ষী-মানব' কবিতার গঠনগত নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে পূর্বের আকাশ এবং বর্তমানের আকাশের বৈপরীত্য কবি চমৎকারভাবে রূপায়িত করেছে । কবিতার প্রথম অংশে আছে চিরন্তন

আকাশের কথা , যে মহাকাশ তলে মহাশান্তি বর্তমান ছিল । কিন্তু তারপরেই কবি প্রশ্ন তুলেছেন 'আজি একি হল' । আকাশলোকে এই পরিবর্তনের কারণ যন্ত্রদানব এরোপ্লেনের আবির্ভাব । কবিতার দ্বিতীয় অংশে এরোপ্লেনের আবির্ভাবে তাই আকাশের কলুষিত হবার কাহিনী কবি রূপায়িত করেছেন ,–

আকাশের সাথে অমিল প্রচার করি
কর্কশধ্বনির গর্জন করি
বাতাসেরে জর্জরি ।

'পুনশ্চ' পর্বে যে বাস্তবতার সূত্রপাত 'নবজাতক' কাব্যেও সেই বাস্তবতার রূপায়ণ অব্যাহত । শুধু পার্থক্য এই যে 'পুনশ্চ' কাব্যে কবির মনে হ'য়েছিল গদ্যছন্দ ব্যতীত বাস্তব পরিবেশকে রূপায়িত করা সম্ভব নয় । কিন্তু বেশ কিছুদিন গদ্যছন্দ চর্চার পর কবি দেখতে পেলেন পদ্যছন্দের সীমার মধ্যেও পারিপার্শ্বিক সংসারের তাঁকে রূপ দেওয়া সম্ভব । 'নবজাতকে' সেই প্রচেষ্টারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে । 'বলাকার ছন্দে লেখা 'রাজপুতানা' কবিতার মধ্যে প্রাচীন শৌর্য মহিমার পাশাপাশি টিটাগড়ের কারখানার কথা সহজেই কবি বলতে পারেন । যেমন এরোপ্লেন তেমনি রাতের রেলগাড়ি বা ব্যস্ত ইস্টেশন তাঁর কবিতার বিষয় হ'য়ে ওঠে । রাস্তার ওপারে ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ীর কথা কবি বলেন । ফেরিওয়ালাদের সাথে ঝুঁকো হাতে দর - কষাকষি , গৃহিণীর অসহিষ্ণু তীব্র ধমকানি , আম শিটুনির শব্দের কথা বললেন কবি । 'ঘোলা গঙ্গাস্রোতে' (এপারে - ওপারে । নবজাতক) সবই কবিতায় এসে যায় কিন্তু তার জন্য গদ্যছন্দ ব্যবহার করতে হয়নি ।

"পুনশ্চ" কাব্যগ্রন্থের গদ্যছন্দ সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে বলেছিলেন , " এর পরে সদ্যচিত আরও - একখানা কাব্যগ্রন্থ বেরবে , তার নাম 'বিচিত্রিতা' । সেটা দেখে ভদ্রলোকে এই

মনে করে আপুত হবে যে, আমি পুনশ্চ প্রকৃতিস্থ হয়েছি।" [২০] দেখা যাবে 'পুনশ্চ'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলির কিছু যেমন গদ্যছন্দে লেখা, তেমনি বেশ কিছু কাব্যগ্রন্থ প্রচলিত ছন্দে লেখা। 'বিচিত্রতা'র কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছেন। 'বীথিকা', 'প্রান্তিক', 'আকাশ প্রদীপ', 'নবজাতক', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলির কবিতা নিয়মিত ছন্দে লেখা। এই তালিকায় ছড়া জাতীয় গ্রন্থগুলির নাম উল্লিখিত হয়নি। আগেই দেখানো হয়েছে নিয়মিত ছন্দে লিখিত হলেও নবজাতকের কবিতাগুলির আঙ্গিকগত একটা বিশিষ্টতা আছে,— যে বিশিষ্টতা সম্ভবত সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাতেই সম্ভব হয়েছে। 'নবজাতক' প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন,— 'প্রথমেই চোখে পড়ে "নবজাতকে"র কবিতাগুলির নিরলংকার বিরলসৌষ্ঠব সুস্পষ্টভাষিতা। এই সুস্পষ্টভাষিতার সূত্রপাত "পরিশেষ" গ্রন্থ হইতেই, কিন্তু তাহার পরেও কবি মাঝে মাঝে বাণীবন্যার উচ্ছ্বসিত স্রোতে নিজেকে ভাসাইয়া দিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, প্রমাণ "পত্রপুট"। কিন্তু "নবজাতক" হইতেই সৃষ্টিলাভ করিল সেই নিরলংকার সুস্পষ্টভাষিতা যাহা উপমা সমস্ত রূপকালংকার, বাহুল্য কল্পনার মায়াজাল একে একে মুক্ত করিয়া শুধু বক্তব্য বিষয়ের উপরই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবে, সুষ্ঠু সুস্পষ্ট অর্থই তাহার ভিত্তি।'[২১]

'নবজাতকে'র পর 'সানাই' কাব্যগ্রন্থ অতিক্রম করে এসে পৌঁছতে হয় রবীন্দ্রনাথের শেষ কাব্যগ্রন্থগুলোতে — 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', 'জন্মদিনে', এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষলেখা'য়। এই গ্রন্থগুলির কোনো কবিতারই নামকরণ করেননি কবি, কবিতাগুলি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত। এই কবিতাগুলি যেন আসন্ন -

....

২০। সাহিত্যের স্বরূপ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পৃষ্ঠা — ৫২২ - ২৩

২১। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা, নীহাররঞ্জন রায়, ১৩৬৯, পৃষ্ঠা - ২২৫।

মৃত্যু কবির দিনসঙ্গীর মতো । শরীরের অপটুতায় ও ব্যাধির আক্রমণে কবির চিত্ত যেন রোগীর মতে মুমূর্ষু । রুগ্ন অবস্থায় লেখা এই কবিতাগুলির প্রকাশে কবির মনে যেন একটা দ্বিধাগ্রস্ততা আছে । "অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দমালা" (রোগশয্যায়) বলে এই কবিতাগুলিকে কবি চিহ্নিত করলেন । তাঁর সেজন্য কবির মনে রয়েছে –

তাই মোর কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে ,
কী জানি শৈথিল্য যদি ঘটে তার পদক্ষেপতালে ।
– ১ সংখ্যক , রোগশয্যায় ।

তাই যেমন কবির , তেমনি সমালোচকদেরও এই কাব্য কয়টি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ততা বর্তমান । ডঃ ক্ষুদিরাম দাস লিখেছেন , – 'ভাষারীতির একরকম শিথিল সারল্য যেমন 'আরোগ্য' কাব্যের তেমনি 'জন্মদিনের' রচনাগুলিতে অনুভবগম্য । তবু 'জন্মদিনে' কাব্যে সারল্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ দুর্লভ নয় ।'[22] সরলতার মধ্যে ঐশ্বর্য থাকাটা যেন স্বাভাবিক নয় এমন একটা ইঙ্গিত উদ্ধৃত অংশের মধ্যে রয়ে গেছে । ভাষাগত সারল্যের মধ্যে কাব্যগত ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ সমালোচকের কাছে অপ্রত্যাশিত মনে হয়েছে । কবি এবং সমালোচকদের এই দ্বিধা সত্যি কি-না রবীন্দ্র কাব্যের শেষ পর্বে এই চারটি গ্রন্থের আলোচনায় সেটা বিচার - সাপেক্ষ ব্যাপার । সেই বিচারের আগে লক্ষ করলে দেখা যাবে কবির ব্যক্তিগত মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং মহাযুদ্ধের ফলে সভ্যতার বিলুপ্তি সম্ভাবনা এই কাব্যগুলিতে যেন একাকার হয়ে গেছে ।

****

২২। চিত্রগীতময়ী রবীন্দ্রবাণী – ডঃ ক্ষুদিরাম দাস , ১৩৭৩ , পৃষ্ঠা – ৩১১ ।

কবির ব্যক্তিগত বেদনা যেন বৈশ্বিক বেদনার প্রতীকের পরমার্থতা অর্জন করেছে । কবি যখন লেখেন –

ঐ মহাবিন্দু, জ্বলে
যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে ,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা ।
– ৫ সংখ্যক , রোগশয্যায় ।

তখন এই যন্ত্রণার মধ্যে কবির রোগ যন্ত্রনাই শুধু নয় , দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন প্রচণ্ড মন্বন্তরের অস্তিত্বও অনুভব করা যায় । জগতের ব্যবধানে যুগে যুগে যে সুতীব্র অপব্যা জমা হ'য়েছে তা-ই বিস্ফোরকভাবে মহাযুদ্ধের আকারে যেন ফেটে ফেটে পড়েছে – ,

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা ।
– ৩৮ সংখ্যক , রোগশয্যায় ।

যখন রাজনীতি এবং রাজনীতির বীভৎসতা কবির সমস্ত মনকে ঘৃণায় ভরে দিচ্ছে তখন তিনি সাধারণ মানুষের উপর আস্থা রাখাই শ্রেয় মনে করেছেন , –

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর - পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে ।
প্রাচীন অশত্থতলা ,
খেয়ার আশায় লোক বসে
পাশে রাখি হাটের পসরা ।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি ,

চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর ।
ভিড় করে মাছি ।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা ,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায় ।

— ৪ সংখ্যক , আরোগ্য ।

আবার আস্থা রেখেছেন শ্রমিক কৃষকের উপর; কেননা —

ওরা চিরকাল
টানে দাঁড় , ধরে থাকে হাল ,
ওরা মাঠে মাঠে
বীজ বোনে , পাকা ধান কাটে ।
ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে ।
রাজছত্র ভেঙে পড়ে , রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে ,
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে ,
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত - আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি ।

— ১০ সংখ্যক , আরোগ্য ।

যখন হিংস্র মনুষ্যের রক্তমাখা দন্তপংক্তি শত শত নগর গ্রামের অন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন করে , যখন শ্মশান বিহার বিলাসিনী ছিন্নমস্তা রক্তপান করে তখনও কবি ঊনিশ শতকী পুরাতন শুভবাদীর মতো ঘোষণা করেন বটে —

দিন - বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।

— ১৪ সংখ্যক , জন্মদিনে।

এবং

আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।

— ২১ সংখ্যক , জন্মদিনে।

কিন্তু মনে হয় চতুর্দিকব্যাপী শিথিল শান্তির মধ্যে এ যেন কবির জোর করে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ব্যক্তিগত জরা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তাণ্ডবের মিলিত ক্ষেত্র থেকে যে কবিতাগুলির জন্ম সেই কবিতাগুলি কি যথার্থই অপটু লেখনীর শিথিল ছন্দোমালা? অথবা আপাত দৃষ্টিতে যাকে মনে হয় ছন্দোগত শিথিলতা তা - ও হয়তো কবির ইচ্ছাকৃত। প্রসঙ্গত শঙ্খ ঘোষ যে চমৎকার পর্যালোচনা করেছেন তা উদ্ধার করা যেতে পারে —

'আত্মসমাহিত এই বিশুদ্ধ আবেগ প্রকাশ করবার জন্য, তাঁর শেষ কবিতাগুলিতে কবি তৈরি করলেন এক ক্ষীণ স্রোত, নির্জীব পয়ারকেও টুকরো করে ভাঙা। সেখানে ছন্দ কোনো জমকালো আওয়াজ দেয় না আর, লাইনগুলো খাটো হয়ে আসে প্রায়ই ধীর আর দুর্বল নিঃশ্বাস - পাতের মতো, কবিতার মাপও হয়ে আসে ছোটো। নিজের 'ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস', তার মধ্যে কেবলই দেখছেন তিনি 'অবরুদ্ধ ভাষা' 'বাণীর ক্ষীণতা' অথবা 'কৃপণ বাণী'। ব্যক্তিগত শীর্ণতার সঙ্গে এখন মিশে গেছে পৃথিবীর বিপর্যয়ের ছবি, সংখ্যাহীন অপচয়ের সামনে, দাঁড়িয়ে থেকে - থেকে কেঁপে ওঠে মন। 'রক্তবর্ণ প্রলাপের অশ্রুস্রোত' ঘিরে ধরছে তাঁকে, মনে হচ্ছে আজ তাই 'কাব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত'। কিন্তু অন্যদিকে বিশ্ব - প্রকৃতিতে আজও আছে প্রশান্ত সুষমা, যেখানে 'ছন্দ নাহি ভাঙে তার সুর নাহি বাধে' অথবা যেখানে 'বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান। ধরণীর প্রাণের আহ্বান'। না - এর আঘাত লেগে আজ

আরো বেশি ছন্দোময় হয়ে উঠছে জীবনের টান। তাই একদিকে 'অখণ্ডিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে' যেতে ওঠা এই সৌরজগৎ, অন্যদিকে আছে 'অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দোমালা'। এই বিপরীতের ওতপ্রোতেই তাহলে তৈরি হচ্ছিল তাঁর শেষ দিনের লেখাগুলি।'[২৩]

কবির এই শেষের কাব্য কয়েকটির বেশীর ভাগ কবিতা অসমমাত্রিক চরণের অপরবৃত্ত ছন্দে লেখা। বহিঃপ্রকৃতিতে 'বলাকা ছন্দ'র সঙ্গে বা 'গৈরিশ ছন্দ'র সঙ্গেই তাঁর আত্মীয়তা নিকট হলেও এই কাব্যগুলির ছন্দে 'বলাকা'র গতি নেই বা 'গৈরিশ ছন্দ'র নাটকীয়তা নেই। এসব কাব্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল ব্যবহার করেছেন, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা করেন নি। গদ্যছন্দে লেখা কবিতার সঙ্গে ভাষাগত দিক থেকে এই পর্বের কবিতার ভাষা ব্যবহারের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। অর্থাৎ গদ্যছন্দে লিখিত না হয়েও এই পর্বের কবিতার ছন্দের মধ্যে কথ্য ভাষার স্পন্দন স্পষ্টই অনুভব করা যায়। সমাসবদ্ধ পদ কমে এসেছে, কমে এসেছে অপরিচিত তৎসম শব্দের ব্যবহার। যদিও আঁকিড়ি, উৎসারিছে, উন্মুদিল, কণ্টকিয়া, উন্মুখি, লঙ্ঘিয়া, সাঁতারিয়া, জিনি, প্রবেশিনু, বেষ্টিয়া, উচ্চারিল, জর্জরি প্রভৃতি প্রাচীন রীতির ক্রিয়াপদ ব্যব-হারের কিছু উদাহরণও পাওয়া যায়। তথাপি এই জাতীয় ক্রিয়াপদ এই পর্বের কবিতার কথ্যভাষার স্পন্দনকে বিঘ্নিত করেনি। কবিতাগুলির মাপ যেমন ছোটো, তেমনি তার পঙ্ক্তির সীমা ছয় আট বা দশ মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কখনো কখনো বারো মাত্রার পঙ্ক্তি আবার কখনো হঠাৎ পাওয়া যায় বাইশ মাত্রার দু একটা আকস্মিক উদাহরণ। যেন ছোটো ছোটো পঙ্ক্তি উচ্চারণের পর হঠাৎ একটা দীর্ঘ পঙ্ক্তি এক ধরণের বিপ্রতীপতা সৃষ্টি করে। একদিকে ব্যক্তিগত জরা ও পৃথিবীর বিপর্যয়, অন্যদিকে শ্যামল পৃথিবীর ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে যে প্যারাডক্স আছে সেই

****

২৪। ছন্দের বারান্দা – শঙ্খ ঘোষ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা – ১২৮।

পর্যায়ক্রমে হয়তো তিনি ছন্দোভঙ্গীর মধ্যেও সংস্কার করতে চেয়েছিলেন । সব কিছু মিলে এই পর্বের কবিতা সম্পর্কে বলা যায় "পদ্যকবিতার সময় থেকে গদ্যের স্তর , ক্রমে উঠছিল তাঁর কবিতায় । এখন , এই শেষ কয়েক মাসে , ওর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চাইছেন বার বার । এমন নয় যে তা তিনি পারছেন সব সময়ে , কিন্তু তবু , যে সব অংশ ছেড়ে দিচ্ছেন তার পরিচয় জানলে বোঝা যায় , লেখা থেকে আজ কীভাবে তিনি মুছে নিতে চাইছেন বাগাড়ম্বর , রেখে দিচ্ছেন শুধু মুরভঙ্গি" । [২৪]

এইভাবে 'বলাকা' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের কাব্য সমূহের এক মহিমাময় ভাস্কর্য । শব্দ দিয়ে দিয়ে কবির প্রতিভা ভাস্করের মতো যে এই সুষমাময় ভাস্কর্য রচনা করেছে তাতে সন্দেহ নেই । ব্যক্তিমনীষাই শুধু স্রষ্টা নয় — কালও প্রচ্ছন্নভাবে সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করে থাকে । দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তীকাল 'বলাকা' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে তার চরণচিহ্নের স্বাক্ষর কখনো প্রকটভাবে কখনো প্রচ্ছন্নভাবে কেমন করে , মুদ্রিত করেছে তারই আলোচনা এই গবেষণা - নিবন্ধে করা হ'লো । তার সঙ্গে সঙ্গে দেখানো হ'লো কালের স্বাক্ষর শুধু বিষয়গতভাবেই নয় আঙ্গিকগত ভাবেও তার ছায়া রেখে গেছে রবীন্দ্র কবিতায় ।

২৪। ছন্দের বারান্দা — শঙ্খ ঘোষ , তৃতীয় সংস্করণ , পৃষ্ঠা - ১২৮ ।